খুদে প্রতিভা • সায়েন্স সঙ্গী • শব্দসন্ধান • নতুন খেলা
আনন্দমেলা
৫ মে ২০২৩
ধারাবাহিক কমিক্‌স
৩টি রকমারি গল্প
বে ড়া নো
শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি
খে লা ধু লো
ধোনির জন্য জয়ধ্বনি
KUNAL 23
পাণ্ডব গোয়েন্দার শেষ অভিযান
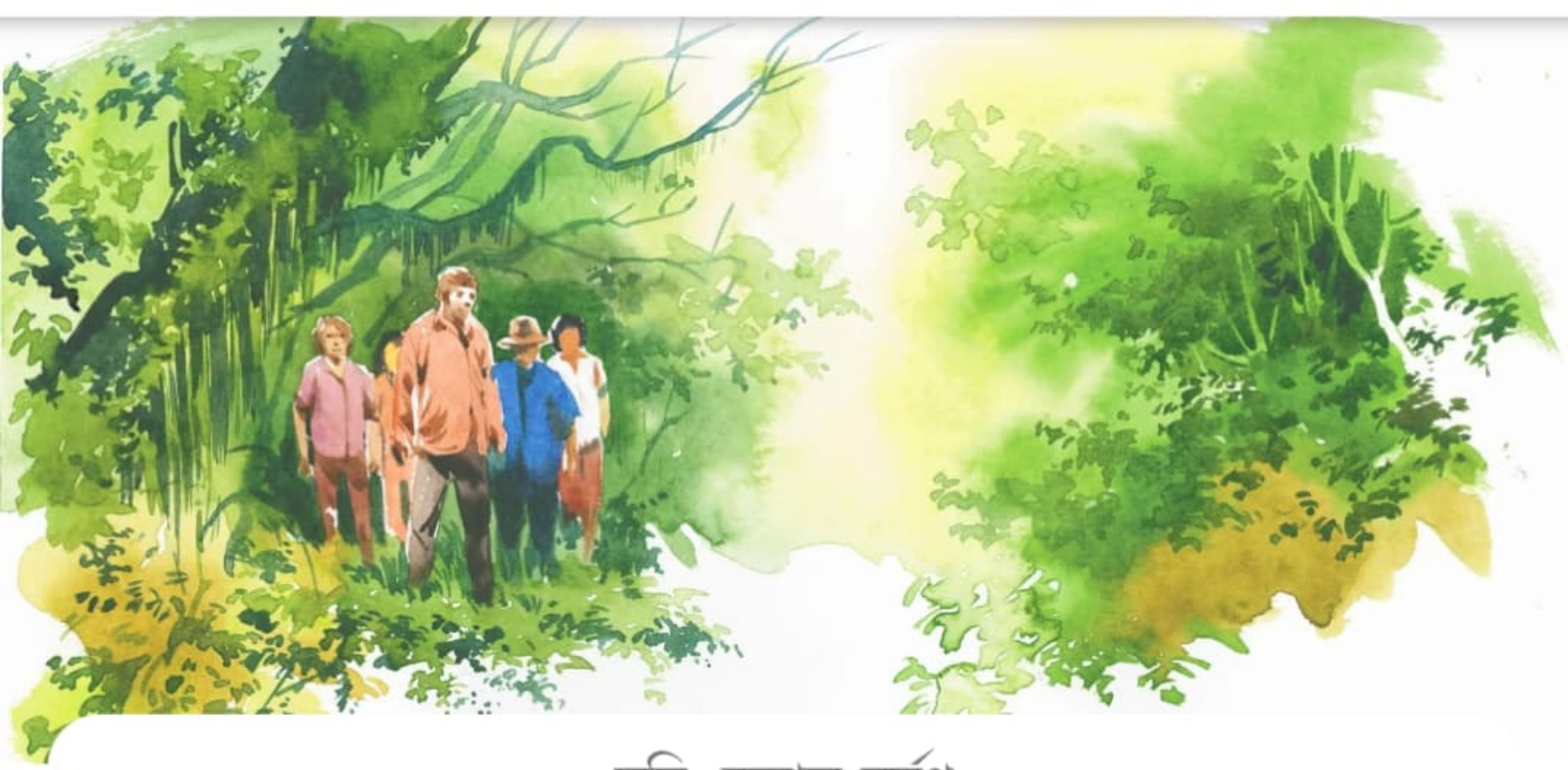
ছবি: কুনাল বর্মণ

পাণ্ডব গোয়েন্দা

সে রাতে দলমা রেঞ্জে ঢোকার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক আলোচনা করল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। কেননা, ওই অভিযানে যাওয়া মানেই জেনেশুনে সাপের গর্তে পা দিতে যাওয়া। তাই ঠিক হল, খুব সকালে হোটেল ত্যাগ করে ওরা ডিমনা হয়ে দলমার বনাঞ্চলে যাবে।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের খুব ইচ্ছে ছিল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে পঞ্চাশটি উপন্যাস লেখার। সেই টার্গেটে পৌঁছোতে খুব বেশি বাকি ছিল না। আনন্দমেলার পাতায় একটা বড় ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর কথা হয়েছিল, বাকি উপন্যাসগুলোও তিনি একে একে এখানেই লিখবেন। সেই মতো নতুন উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন। মোবাইলে জানিয়েছিলেন, "অনেকটা লিখে ফেলেছি। বাকিটুকুও এর মধ্যে শেষ করে ফেলব।"

কিন্তু তার পরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। বাড়ি এবং নার্সিংহোমের মধ্যে যাতায়াত বাড়তে থাকল। শেষে উপন্যাসটি অসমাপ্ত রেখেই তিনি পাড়ি দিলেন অনন্তলোকে। দু' খেপে সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি যখন আমাদের দফতরে এল, তখন দেখা গেল বেশির ভাগটাই লেখা হয়ে গিয়েছে। অতি অল্পই বাকি ছিল শেষ করতে। এই অসমাপ্ত উপন্যাসও আগের লেখাগুলোর মতো জমজমাট। ছোটদের মন জয় করবে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই প্রায়-সমাপ্ত উপন্যাসটি প্রকাশ করা হবে। এ বারের সংখ্যায় রয়েছে সেই উপন্যাসই।

সম্পাদক

অন্য দিনের মতো সে দিনও ভোর হল। তবে অজস্র পাখির কলকণ্ঠে নয়, পাখির সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুমধুর শঙ্খরবে। এত ভোরে কোথা থেকে ভেসে আসে এই শঙ্খধ্বনি! ধ্বনিটা ক্রমশ ধীরে ধীরে বাবলুর ঘরের দিকেই এগিয়ে আসতে থাকল।

মা-বাবা দু'জনেই তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।
পঞ্চুও সজাগ হয়েছে।

বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলেই দেখল আকাশের ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি।

পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' করে বাইরে এল।

শঙ্খধ্বনি এসে থামল ওদের ঘরের কাছে। মঙ্গলশঙ্খ হাতে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল সুকন্যা।

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "হঠাৎ এমন শঙ্খধ্বনি কেন?"

"দারুণ একটা সুখবর আছে, তাই। বাগানে চলো, সবাই আসুক তখনই বলব।"

এরই মধ্যে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকেও আসতে দেখা গেল।

সবাই তখন পঞ্চু সহ দলবদ্ধ হয়েই বাগানের দিকে চলা শুরু করল। আর সুকন্যা মাঝে মাঝেই শঙ্খরবে ভরিয়ে তুলল চার দিক।

বাচ্চু, বিচ্ছু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "ব্যাপারটা কী! কিছুই তো বুঝছি না!"

সুকন্যা ওদের সবাইকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে এসে বসল।

এ বার সবাই ওর মুখের দিকে তাকালে সুকন্যা বলল, "আমার শঙ্খবাদন শুনে সবাই খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? আসলে দারুণ একটা সুখবর আছে আমাদের সকলের জন্য।"

বাবলু বলল, "সুখবরটা কী, সেটা তো বলো?"

সুকন্যা বলল, "আগামী পনেরোই অঘ্রান লতা আর মৃধা দু'জনেরই শুভ বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে।"

এ কথা শুনে হই হই করে উঠল সকলে।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "এ তো সত্যিই সুখবর।"

বাবলু বলল, "কখন পেলে খবরটা?"

"কাল অনেক রাতে, মানে রাত প্রায় বারোটার সময় লতার মা খবরটা জানালেন আমাকে। যে অভিযাত্রী দলের সঙ্গে লতা ট্রেক করে, তাদেরই এক জনের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ওর। মৃধার খবরটাও একই সঙ্গে শুনলাম। ওর বিয়ের কথা হয়েছে আলিগড়ের এক ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "সকলের শুভ হোক। দুঃখটা এই, লতা তা হলে এখন থেকে আমাদের নাগালের বাইরে।"

বাচ্চু জানতে চাইল, "ওর বিয়েটা কোথায় হচ্ছে?"

"শুনলাম চণ্ডীগড়ে। বিয়ের পর ওরা নাঙ্গাল ড্যামের কাছে থাকবে। আরও খবর, মেয়ের বিয়ের পর ওর মা-বাবাও এখানকার পাট চুকিয়ে মেয়ের বাড়ির কাছাকাছিই গিয়ে থাকবেন।"

বিলু, ভোম্বল এত ক্ষণ চুপ ছিল। এ বার আনন্দ প্রকাশ করে বলল, "এমনই তো হওয়া

উচিত। তবে মৃধার জন্য নয়, লতার জন্যই মনটা খারাপ হয়ে যাবে আমাদের। কেননা, ও আমাদের বড় বেশি কাছের জন হয়ে উঠেছিল।”

বাবলু বিরস বদনে বলল, “এই ভাবে একে একে অনেকেই হারিয়ে যাবে আমাদের চোখের সামনে থেকে। সুকন্যা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গিনী। সে-ও এক দিন হারিয়ে যাবে। তার পর বাচ্চু-বিচ্ছুও।”

বাচ্চু ধমক দিয়ে বলল, “তুমি চুপ করবে বাবলুদা? যখন যা হওয়ার, তখন তা হবে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযান যত দিন চলবে, তত দিন সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাব আমরা। এখন এসো, সবাই মিলে আমরা লতা ও মৃধার মঙ্গল কামনা করি। ওরা যেন জীবনে সুখী হয়।”

ভোরের আবছা ভাব কেটে গিয়ে অগ্রহায়ণের সোনার রোদে তখন ঝলমল করছে চার দিক। মিত্তিরদের বাগান পরিচর্যার গুণে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। এক জায়গায় এত গাঁদা ফুল ফুটেছে যে, তার শোভা ও সৌন্দর্যে বাগানের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। ওরা অনেক ক্ষণ ধরে চার দিক ঘুরে দেখে পঞ্চুকে নিয়ে যখন খেলায় মাতল, তখন সুকন্যাই বলল, “আর কত ক্ষণ থাকবে এখানে? মাসিমাকে সুখবরটা দিতে হবে না? তা ছাড়া ঘরে গিয়ে চায়ের কাপে চুমুকটাও তো দিতে হবে।”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। এই চলো, সবাই ঘরের দিকেই যাওয়া যাক।”

অতএব কেউ আর কোনও দিকে না-তাকিয়ে রওনা হল ঘরের দিকে। পঞ্চু গেল সবার আগে। ও কিছু না-বুঝলেও, ওর আনন্দ যেন সবার চেয়ে বেশি।

ঘরে এসে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সবাই এক জোট হয়ে বসলে শুভলক্ষ্মী দরজার কাছে এসে বলল, “আগে কী খাবে বলো, পান্নার শিঙাড়া না চা?”

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখ কপালে উঠে গেল এ কথা শুনে! খাবেই তো। এত সকালে শুভলক্ষ্মী এখানে কী করে এল?

ভোম্বল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, “আগে একটা ডিগবাজি খাব, তার পর ওই সব। তার আগে বলো, এত সকালে তুমি এখানে কী করে এলে?”

বাবলু বলল, “তোমার এই আগমনটা অপ্রত্যাশিত হলেও প্রত্যাশিত। কেননা আমাদের

চা-পর্ব শেষ হলেই আমরা তোমাকে একটি সুখবর শোনানোর জন্য আসতে বলতাম।”

“কী সেই সুখবর?”
“লতা ও মৃধার বিয়ে।”

শুনেই চোখ কপালে উঠে গেল শুভলক্ষ্মীর, “সত্যি!”

বাবলু বলল, “সত্যি না হলে কি তোমার সঙ্গে আমরা রসিকতা করছি? এখন সন্দেহ হচ্ছে তুমিও এই রকম কোনও সুসংবাদ নিয়ে আসোনি তো?”

শুভলক্ষ্মী বলল, “না রে বাবা, না। আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে। এখন চুপ করে বসো সবাই। আমি তোমাদের জন্য চা-শিঙাড়া নিয়ে আসি,” বলেই চলে গেল যথাস্থানে।

ওকে সাহায্য করার জন্য সুকন্যাও ওর পিছু নিল।

একটু পরেই মা সবাইকে নিয়ে ঘরে এলেন। বাবাও এলেন সঙ্গে। সুকন্যার মুখে সংবাদ পেয়ে খুব খুশি হলেন তাঁরা।

এ বার শুরু হল জলযোগ পর্ব।

শিঙাড়া, জিলিপি আর মায়ের হাতে তৈরি চা।

বাবলু বলল, “শিঙাড়া না হয় পান্না সুইটস থেকে এসেছে, কিন্তু জিলিপি?”

শুভলক্ষ্মী বলল, “ওটা তো তোমাদেরই এখানকার সিদ্ধেশ্বরীতলা থেকে।”

“খুবই উপাদেয়।”

এর পর সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে জলযোগ পর্ব শেষ করল। শিঙাড়া, জিলিপি পেয়ে পঞ্চুরও আনন্দের শেষ নেই।

বাবলু শুভলক্ষ্মীকে বলল, “তুমি এই ভাবে হঠাৎ করে এসে পড়ায় আমাদের কিন্তু আনন্দের উৎসব আজ।”

“আরও আনন্দের একটা বার্তা নিয়েই আমি কিন্তু এসেছি এখানে। তবে কিনা সেই আনন্দটা শেষ পর্যন্ত নিরানন্দও হতে পারে।”

বিলু এ বার শুভলক্ষ্মীর চোখে চোখ রেখে বলল, "রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!"

শুভলক্ষ্মী বলল, "ঠিক তা-ই!"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ সবের আলোচনা ঘরের মধ্যে নয়। চলো, সবাই মিত্তিরদের বাগানে যাই। আমি চট করে মাসিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার থেকে মাংস নিয়ে আসি। আজ দুপুরে স্রেফ মাংস-ভাত।"

অতএব আর সময় নষ্ট নয়।

ওরা সবাই বাগানে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে বাবলুর মা ঘরে এসে বললেন, "ভোম্বলকে এখন আর কষ্ট করে বাজারে যেতে হবে না। শুভলক্ষ্মী এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পাশের বাড়ির গোপালকে দিয়ে সে কাজটা করিয়ে রেখেছি। এখন তোমরা দলছুট না হয়ে বাগানেই যাও।"

অতএব সবাই ওরা এক জোট হয়ে বাগানের দিকেই চলল।

যেতে যেতেই শুভলক্ষ্মী বলল, "এক এক সময় আমার কী মনে হয় জানো? তোমাদের এই বাগানেই ভাঙা বাড়ির থেকে অল্প দূরত্বে ছোট্ট একটা বাংলো করে এখানেই থেকে যাই। তা হলে তোমাদের ঐতিহ্যও বজায় থাকে। আমারও..."

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমাদের কিন্তু অমত নেই। ঠিক ফুলবনের গা ঘেঁষে অমন একটা কিছু হয় যদি, তো মন্দ কী?"

বাবলু অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু বলল না। তবে সবাই ওরা সেই ভাঙা বাড়ির চাতালেই এসে বসল।

বাবলু শুভলক্ষ্মীকে বলল, "এ বার বলো দেখি, আনন্দের কী এমন বার্তা তুমি বয়ে এনেছ?"

"আমি তোমাদের জন্য দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা করেছি। জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়। ঘরের কাছেই বলতে পারো।"

"কোথায় সেটা?"

"টাটানগরে। তোমরা তো সেখানে গিয়েছও দু'-এক বার।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, "গেছিই তো!"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরা সবাই গেছি।"

"তা হলে ডিমনা লেক সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই বেশ ভাল রকম অভিজ্ঞতা আছে।"

বাবলু বলল, "রমণীয় সৌন্দর্যের জায়গা ওটা!"

"কিন্তু ওই ডিমনার অরণ্যময় পরিবেশটাও কি রমণীয়? হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা ওই আতঙ্ক যে অত্যন্ত ভয়াবহ। আমি তোমাদের সাহায্য নিয়ে ওই ডিমনার আতঙ্ক জয় করতে চাই।"

শুভলক্ষ্মীর কথা শুনে চোখ কপালে উঠে গেল সকলের!

বাবলু বলল, "হঠাৎ এমন অদ্ভুত খেয়াল চাপল কেন মাথায়? ওই অভিযানে পদে পদে বিপদ। হিংস্র শত্রুর মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে সব সময়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নামতে হয় ওই কাজে। একটু অসতর্ক হলেই চরমতম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। অতএব নিছক জেদের বশে ওই অভিযান না করাই ভাল। তবে ডিমনার লেক দেখে ওই অরণ্যে খুব সতর্ক হয়ে কিছুটা ভিতরে ঢুকে ফিরে আসা যায়। ভয়ঙ্কর রকমের বদমেজাজি বুনো হাতির দল সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় ওখানে। ওদের নজর এড়িয়ে ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। এর পর আছে হিংস্র ভালুকের উপদ্রব। নানা প্রজাতির বাঘও আছে ওখানে। অতএব আমার মনে হয়, এই রকম কোনও ঝুঁকি না-নেওয়াই ভাল। এই হঠকারিতায় আমাদের এক জনেরও কারও ক্ষতি হলে মরমে মরে যাব আমরা।"

শুভলক্ষ্মী এ বার একটু চুপ থেকে বলল, "আসলে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের বাসিন্দা আমার কয়েক জন বান্ধবী কয়েক দিন আগে ডিমনায় ওই দুঃসাহসী অভিযান করতে গিয়ে দারুণ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। দলে ওরা পাঁচ জন ছিল। তার ভিতর থেকে তিন জন প্রাণে বেঁচে ফিরলেও বাকি দু'জন নিখোঁজ। খবরটা খুব ছোট্ট করে কাগজেও বেরিয়েছে ক'দিন আগে। এখনও তাদের কোনও সন্ধান মেলেনি। ওখানকার পুলিশ-প্রশাসনও বলেছে ওদের আশা ছেড়ে দিতে। সে জন্যই আমি ভাবছিলাম আমরা গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখলে যদি ওদের কোনও সন্ধান পাই, তো কেমন হয়?"

বাবলু বলল, "এ কথা তো তুমি আগে বলোনি। কাজটা যদিও দুরূহ, তবু এ ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। তবে ডিমনার আতঙ্কের মধ্যে দিয়েই নিখোঁজদের সন্ধানে তদন্ত চালাতে

আমরা আগ্রহী। তবে ডিমনার আতঙ্কের মধ্যে দিয়েই নিখোঁজদের সন্ধানে তদন্ত চালাতে হবে আমাদের। হয়তো সফল হব না। তবু চেষ্টা করে দেখব।”

শুভলক্ষ্মী বলল, “ওতেই হবে। তবু তো নিজের মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারব এই বলে যে, বান্ধবীর জন্য পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাহায্য নিয়ে কিছু একটা করেছি।”

বিলু বলল, “ওই ভীষণ দুর্গমে এমন একটা ঝুঁকির কাজ করতে যাওয়ার ব্যাপারে আমার মন কিন্তু সায় দিচ্ছে না।”

ভোম্বল বলল, “আমিও ওই একই কথা বলব।”

সুকন্যা বলল, “এ যাত্রায় পঞ্চুকে কি সঙ্গে নেবে? তোমাদেরই মুখে শুনেছি বাঘের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কুকুর। অতএব এই অভিযানে জেনে শুনে পঞ্চুকে কোনও বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?”

বাবলু বলল, “না। ওর জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হবে,” তার পর একটু থেমে শুভলক্ষ্মীকে বলল, “তোমার ওই বান্ধবীদের এক জনকেও কি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাওয়া যাবে? ঘটনার বিবরণ ওদের মুখে না-শুনলে আমরা জানব কী করে, ওরা কোন পথে গেছে, কী ভাবে গেছে? দুই বান্ধবীকে হারিয়ে, ওরাই বা ফিরে এল কী করে?”

“না। ওই ঘটনার পর ওদের বাবা-মা ওদের স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই এক জনকেও পাওয়া যাবে না।”

“তোমার ওই নিখোঁজ বান্ধবীদের নাম?”

“এক জনের নাম জয়ন্তিকা ভাট, অপর জন তানিশা যাদব।”

“ওরা কেউই ওদের বিপদের কথা জানিয়ে বাড়িতে কোনও ফোন করেনি?”

“না। সত্যিই যদি কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে থাকে ওরা, তা হলে বাড়িতে ফোন করার অবকাশ পাবে কখন?”

বাবলু বলল, “এই রকম অবস্থায় আর আমাদের দেরি না করে ওদের উদ্ধারের ব্যাপারে এখনই তৎপর হওয়া ভাল। কাল সকালের দিকে যে ট্রেন আছে, সেই ট্রেনেই রওনা দেওয়া যাক।”

শুভলক্ষ্মী বলল, "না। ট্রেনে নয়। আমি একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করছি। তাতেই যাব সবাই। কেননা সঙ্গে আমাদের অনেক জিনিসপত্তর নিশ্চয়ই থাকবে। আমারও একটা পিস্তলও আছে। তা ছাড়া বাকি যা, তা ওখানে গিয়েই ব্যবস্থা করে নেব। স্থানীয় কয়েক জন লোককেও সঙ্গে নিতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "বেস্ট সাজেশন। কাল সকালের জন্যই তৈরি হও সকলে।"

এর পর দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুভলক্ষ্মী বিদায় নিল।

আবার একটা অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

পর দিন খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতে শুভলক্ষ্মীর ফোন এল, "আমরা রেডি তো? আমি এখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। তবে মা-বাবার ঘোর আপত্তি, ভুলেও গাড়ি নিয়ে অত দূর নয়। হাওড়া থেকে সকালের দিকে ট্রেনেই টাটানগরে যাব আমরা। অতএব..."

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চটপট তৈরি হয়ে নিল।

এত সকালেও হাওড়া স্টেশনে ভিড়ের অন্ত নেই। তবু ওরা টিকিট কেটে ট্রেন আসতেই পছন্দসই সিট দখল করে নিল সকলে। এ যাত্রা কতটা সফল হবে, ওদের তা জানা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখা। কিছু না হলেও, বেড়ানো তো হবে।

ট্রেন ছাড়লে কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে মনের আনন্দে রওনা দিল ওরা।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর কোলাঘাটের ব্রিজ পেরিয়ে মেচেদা পাঁশকুড়া হয়ে খড়্গপুরে পৌঁছোল ওরা। কত স্মৃতি এখানকার। এর পরে ঝাড়গ্রাম হয়ে ঘাটশিলা থামল ট্রেন। সেই ঘাটশিলা, সুবর্ণরেখা নদী, ফুলডুংরি পাহাড়, ধারাগিরির ঝর্না... সব যেন এক এক করে ছবির মতো ফুটে উঠতে লাগল। তার পরে এক সময় টাটানগর। ওরা সবাই ট্রেন থেকে নামল এ বার।

দীর্ঘ দিনে কত পরিবর্তন হয়েছে এই শহরের। ওরা যেন ওদের হারানো অতীতকে ফিরে পেল। এর পর স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে ট্রেন জার্নির ক্লান্তি দূর করল। বেলা তখন সাড়ে দশটা।

যাই হোক, ওরা হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে সামান্য একটু নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়ল আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখতে।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমাদের আসল কাজ শুরু করব কাল সকাল থেকে। এখন শুভলক্ষ্মী ও সুকন্যাকে এখানকার বিখ্যাত জুবিলি পার্ক থেকে ঘুরিয়ে আনি।"

অতএব ওরা একটা বড় গাড়ি নিয়ে জুবিলি পার্কের দিকেই চলল।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "আসলে এই জায়গাটা এক সময় ছিল পুরোপুরি বনাঞ্চল। তখন এর নাম ছিল সাকচি। জামশেদজি টাটানগর স্থাপন করে ইস্পাত কারখানা তৈরি করলে মুখে মুখে এর নাম হয় টাটানগর। মহীশূরের (মাইসুরু) বৃন্দাবন গার্ডেনের ধাঁচে ধাপে ধাপে গড়া দুশো পঁচিশ একর বিস্তৃত এখানকার জুবিলি পার্কও এক অন্যতম আকর্ষণ।"

ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে জুবিলি পার্কে ঢুকতেই পঞ্চুর আনন্দ যেন লাগাম ছাড়া হয়ে গেল। সুকন্যা ও শুভলক্ষ্মীরও এই প্রথম। অনেকটা সময় ধরে ওরা পার্কের নানা প্রান্তে ঘুরে ফিরে এল হোটেলে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সাকচি থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হল ডিমনা লেকের দিকে।

ডিমনায় পৌঁছে এক বারের জন্যও কারও মনে হল না, এখানে কোনও আতঙ্ক আছে বলে। দলমা পাহাড়ের কোলে নয়নাভিরাম ডিমনা ওদের সকলেরই নয়ন, মন ভরিয়ে দিল।

শুভলক্ষ্মী বলল, "না। এখানে কোনও আতঙ্ক নেই। থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই ওরা অন্য কোথাও গিয়ে বিপদে পড়েছে।"

বাবলু বলল, "রহস্যটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে। আসলে ওরা ডিমনায় এসে দলমার রেঞ্জে ঢুকতে গিয়েই বিপদ বাড়িয়েছে নিজেদের। আমাদের অভিযান তাই ডিমনায় নয়। দলমার বিপজ্জনক অরণ্যে।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "তা হলে আর ঝুঁকি না নিয়ে, ফিরেই যাই চলো।"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এ রকম কখনও হয়নি। হয়ও না কোনও দিন। কাল সকাল থেকে শুরু হবে অভিযান।"

ডিমনা লেক থেকে ফেরার পথে শহরের প্রাণকেন্দ্রে আলোক উৎসব দেখে সন্ধের পর হোটেলে ফিরল সবাই। এর পর আগামী কালের প্রস্তুতি নিয়ে গোছগাছের কাজটা সেরে রাখল আগেভাগেই।

সে রাতে দলমা রেঞ্জে ঢোকার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক আলোচনা করল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। কেননা, ওই অভিযানে যাওয়া মানেই জেনেশুনে সাপের গর্তে পা দিতে যাওয়া। তাই ঠিক হল, খুব সকালে হোটেল ত্যাগ করে ওরা ডিমনা হয়ে দলমার বনাঞ্চলে যাবে। তার পর ওখানেই কোথাও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে শুরু করবে তদন্তের কাজ। মেয়েরা দূরে অবস্থান করে লক্ষ রাখবে ওদের গতিবিধির দিকে। সবাই এক মত হলে, যে যার জায়গায় গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল। সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে সুখের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল সবাই।

পর দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা-পর্বের পর হোটেল থেকে বিদায় নিতে গেলে ম্যানেজার বললেন, "কাল এসে আজই চলে যাচ্ছ যে? কিছুই তো দেখা হল না তোমাদের।"
বাবলুর হয়ে পঞ্চু উত্তর দিল, "ভৌ ভৌ।"

ম্যানেজার বললেন, "দারুণ তো। তোমাদের এই কুকুরটাকে দেখে আমার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কথা মনে হচ্ছে।"

বাবলু হেসে বলল, "আমরা তারাই।"

ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে ওদের বসতে বলে আর-এক কাপ করে কফি ও পঞ্চুর জন্য কেক আনিয়ে খেতে দিলেন। বললেন, "ব্যাপার কী তোমাদের? কোনও অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা আছে নাকি?"

বাবলু তখন সব বলল।

শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে ম্যানেজার বললেন, "দু'-তিন দিন আগের ওই ঘটনাটার কথা আমি শুনেছি বটে, তবে এখন ওদের অনুসন্ধানে যাওয়া তোমাদের বৃথা হবে। আরও বলি, ওই অরণ্যে বাঘের চেয়েও দাঁতাল হাতি ও ভালুকের উপদ্রব বেশি। যা-ই হোক, যা করবে, তা কিন্তু ঠান্ডা মাথায়। তবে তোমরা ডিমনা হয়ে দলমার দিকে গেলে চান্দের নামে আমার এক জন লোক আছে। ওকে সবাই ওখানে 'জঙ্গল শের' বলে। তোমরা তার সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলবে। ও তোমাদের সব রকমের সাহায্য করবে। শুধু তা-ই নয়, নিরাপদ জায়গায় থাকারও ব্যবস্থা করে দেবে। ওকে অমান্য করে কিছু করতে যাবে না তোমরা। ও থাকলে বনের হিংস্র জন্তুদেরও হৃৎকম্প হবে।"

অতঃপর ওরা সবাই এ বার ম্যানেজারের সঙ্গে করমর্দন করে রওনা হল নিখোঁজদের

সন্ধানে।

ম্যানেজারের নির্দেশে বড় একটা গাড়ি ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল বাইরে। ওরা সবাই তাতে চেপে বসলে গাড়ি ছুটে চলল দলমা রেঞ্জের দিকে। ডিমনার কাছে এসে চান্দেরের নাম করতেই দেখা মিলল তার। দারুণ মিষ্টি চেহারার জংলি যুবক চান্দের ইতিমধ্যে ফোনে খবর পেয়েছিল ম্যানেজারের মুখে। ওরা যেতে দু'হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে আহ্বান জানাল। বলল, "শুনেছি সব। কিন্তু আমাদের এই বন প্রদেশে মনের মতো ঘর হয়তো পাবেন না। তবুও নিরাপদে থাকতে পারবেন, এই ভরসাটুকু দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "তা হলেই হবে চান্দের ভাই। তুমি সহায় মানে, ভগবান সহায়।"

চান্দের হেসে বলল, "কী যে বলেন!" বলে বড় একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল সকলের জন্য।

ওরা সবাই ঘরের দখল নিলে, কুঞ্জা ও মালিজা নামে দু' জন মেয়েকে ডেকে এনে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এর পর কফি আর কেকের ব্যবস্থা হলে চান্দের বলল, "আমি একটু অন্য কাজে যাব। তোমরা এই দু'জনের সঙ্গ ছাড়া জঙ্গলে ঢুকবে না। কাছেই খাওয়ার হোটেল আছে। বেলায় ফিরে এসে ওখানেই খেয়ে নিতে পারো।" কুঞ্জা বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। এই ক'জনের মাংস-ভাত আমরাই রেঁধে দিতে পারব।"

বাবলু বলল, "এমনই হওয়া উচিত। গরম ভাত আর মুরগির মাংস, দারুণ জমবে তা হলে। এখন দলমা রেঞ্জের চেহারাটা দেখে আসা যাক।"

কুঞ্জা বলল, "বেশি ভিতরে ঢোকার দরকার নেই। জঙ্গলের রূপ দেখে, পরিস্থিতি বুঝে, তার পর এগোনো যাবে। কিন্তু কোন সূত্র ধরে, কী ভাবে এগোবে, সেটা ঠিক করবে তোমরা। আমি মালিজাকে রেখে যাচ্ছি তোমাদের মাংস-ভাতের ব্যবস্থা করতে," বলে বলল, "তোমাদের কাছে আত্মরক্ষার মতো কিছু কি আছে?"

"আছে। আমার আর শুভলক্ষ্মীর কাছে আছে পিস্তল। অন্য সব ছেলে-মেয়ের কাছে রয়েছে ধারালো ছুরি।"

"আপাতত ওতেই হবে। আমি একটা কুড়ুল সঙ্গে নিচ্ছি।"

সুকন্যা বলল, "আমাকেও একটা কুড়ুল দাও তা হলে। বিপদে পড়লে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করব।"

"বেশ। তা হলে এখনই রওনা হওয়া যাক।"

বাচ্চু বলল, "একটা মশাল আর দেশলাইও সঙ্গে রাখা যাক তা হলে! প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।"

কুঞ্জা বলল, "এখনই কাজে লাগবে না। কেননা, একটু অসতর্ক ভাবে ওই জঙ্গলে হঠাৎ আগুন লেগে গেলে অন্য বিপর্যয়ও ঘটে যেতে পারে। তবে জঙ্গলে ঢোকার মুখে ওখানকার কিছু আদিবাসীও আমাদের অনুগত। তাই নির্ভয়ে এগিয়ে চলো।"

অতএব আর বিলম্ব না-করে ওরা ডিমনা অতিক্রম করে দলমার দিকে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পরই ওরা বুঝতে পারল, সত্যিই বিপজ্জনক অরণ্য এটা। পাহাড়ের কালো পাথরের সঙ্গে ঘন বনভূমির এক ভয়াবহ অবস্থান। বিপদ এখানে প্রতি মুহূর্তে এবং পায়ে পায়ে।

যাই হোক, গভীর বন প্রদেশে ঢোকার আগে কুঞ্জার পরিচিত আদিবাসী-পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হল সকলের।

শুভলক্ষ্মী তখন ওদের কাছেই জানতে চাইল, ওর বান্ধবীদের কেউ এখানে এসে বিপদে পড়ার কথা জানিয়েছে কি না। জানতে চাইল, ওরা কেউ ওদের ব্যাপারে কি কিছু জানে?

ওদের মধ্যে মাতন নামের একটি মেয়ে বলল, "আমি জানি। আমি ওদের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু ওরা আমার কথা শোনেনি। এই সময় হঠাৎ ভালুকের তাড়া খেয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তবে তার পর কিন্তু ওদের কাউকেই আর বেরিয়ে আসতে দেখিনি।"

বাবলু বলল, "ওরা পাঁচ জন ছিল। তার মধ্যে থেকে তিন জন ফিরেছে। বাকি দু'জন ফেরেনি। আমরা তাদেরই খোঁজে এসেছি।"

মাতন বলল, "তা হলে একটা ভাল কথা বলি শুনুন। ওদের আশা ছেড়ে দিন। এই জঙ্গলের সর্বত্র মৃত্যুফাঁদ। মাঝে মধ্যে যারা আসে তারাও দলবদ্ধ হয়ে। তাও বেশি ভেতরে ঢোকে না কেউ।"

কুঞ্জা বলল, "মাতন, যত ক্ষণ কোনও হিংস্র জন্তুর আবির্ভাব না হয়, তত ক্ষণ আমরা এদের একটু গাইড করি চলো। কাউকে উদ্ধার করা না-গেলেও জঙ্গলের চেহারাটা তো দেখুক ভাল করে।"

বলতে বলতেই মাতনের হুঁশিয়ারিতে সচেতন হল সকলেই।

কুঞ্জা বলল, "এখন আর এক পা-ও এগোনো নয়। বুনো হাতির দল ধীরে ধীরে এ দিকেই এগিয়ে আসছে।"

অতএব পঞ্চুকে নিয়ে সবাই পিছু হটল ওরা। তার পর চান্দেরের সেই আস্তানায় এসে জুটল।

কুঞ্জা বলল, "এই কাছেই আমাদের ঘর। তাই কোনও অসুবিধে হলে জোরে হাঁক দিয়ে ডাকবে আমাদের। মালিজা আর আমি একই জায়গায় পাশাপাশি থাকি। এক বার হাঁক দিলে দু'জনেই ছুটে আসব আমরা।"

বিলু বলল, "জঙ্গলে যে বুনো হাতির দলকে দেখলাম, ওরা মাঝে মাঝে নেমে আসে না এখানে?"

"না। তবে ভালুকের দল কখন যে নেমে আসবে পাহাড় থেকে তার কোনও স্থিরতা নেই। তাই বলি, সন্ধের পর ভুলেও কেউ এখানকার চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে বেরোবে না।"

বিচ্ছু বলল, "এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সচেতন।"

ওদের সবাইকে ফিরে আসতে দেখে মালিজা বলল, "তোমাদের খাবার রেডি।"

বাবলু বলল, "আমাদের খাবার মানে? তোমরা খাবে না?"

"আমরাও খাব। সেই রকম আয়োজনই করেছি। আমরা এখানে হাঁস-মুরগি পালন করি। দেশি মুরগি। খেয়ে দেখবে, এর স্বাদ কেমন। এখন তোমরা যদি স্নান করতে চাও তো লেকের জলে অথবা এখানকার ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্নায় স্নানের পাট চুকিয়ে নিতে পারো।"

বাবলু বলল, "আমরা ঝর্নার জলেই স্নান করব। এই গভীর ডিমনায় নেমে কারও বিপদ ঘটুক, এটা আমরা চাই না।"

অতএব কুঞ্জার সঙ্গ নিয়ে সবাই ওরা ঝর্নার জলেই স্নানের পাট চুকিয়ে নিল। তার পর

ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করে, যাওয়ার প্রস্তুতি নিল সবাই।

কুঞ্জা মালিজাকে বলল, "তুই এত ক্ষণ রান্নার দায়িত্বে ছিলি। তাই আমি এ বার পরিবেশনে হাত লাগাই।"

পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে কী দারুণ খাওয়া! সুস্বাদু রান্নার গুণে মন-প্রাণ যেন ভরে গেল।

মালিজা বলল, "কেমন লাগল আমার হাতের রান্না?"

সবাই এক জোটে বলল, "দারুণ।"

কুঞ্জা বলল, "তবে একটা কথা, আজ কিন্তু তোমরা আমাদের অতিথি। বিকেলে হবে রুটি আর মাংস। কোনও হিসেব-নিকেশের ব্যাপার রাখবে না," বলে একটু চুপ থেকে বলল, "আসলে তোমাদের এই দলটিকে আমাদের দু'জনেরই খুব ভাল লেগে গেছে।"

পপ্পু এক পাশে বসে মনের সুখে খেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই এক সময় 'গোঁ-ও-ওও' করে উঠল। অতএব বোঝাতে চাইল, ওর কথা কেউ বলল না কেন?

মালিজা বুঝতে পেরে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকেও ভাল লেগেছে আমাদের।"

যাই হোক, এই ভাবেই এক সময় খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা শেষ হল। এর পর অনবদ্য প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতাতে এ বার যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো।

বেশি দূরে না-গেলেও সবাই ওরা দলমার রেঞ্জের মধ্যেই রইল। তবে কুঞ্জা ও মালিজা কিন্তু সব সময় ওদের চোখে চোখেই রাখল।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় বেশ খানিকটা ভিতরে চলে এল ওরা। আবার দেখা হল মাতনের সঙ্গে।

মাতন বলল, "এই অবেলায় কেন এলে?"

বাবলু বলল, "অবেলা কোথায়? সবে তো দুপুর দুটো। দিনের আলো এখনও স্পষ্ট।"

কুঞ্জা, মালিজা বলল, "এটাই আমাদের কাছে অবেলা। এখন যে কোনও মুহূর্তে ভালুকের দল এ দিক সে দিক থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "সেই হাতির দল বিদায় নিল কখন?"

"অনেক ক্ষণ। তবে একেবারে বিদায় নেয়নি কিন্তু। একটু দূরে কোথাও-না-কোথাও আছে ওরা।"

কথা বলতে বলতে ওরা আরও একটু এগিয়ে উচ্চভূমির দিকে গেলে হঠাৎই পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাকে সচকিত হল সবাই। ওরা দেখল পাহাড়ের বেশ খানিকটা উঁচুতে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর পেখম মেলেছে। তাদের মধ্যে কেউ নাচছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী বাহার, কী বাহার! এমন ময়ূর-নাচ কখনও দেখেনি ওরা। একটা-দুটো নয়, প্রায় শতাধিক ময়ূর।

শুভলক্ষ্মী বলল, "এমন ময়ূর-নৃত্য জীবনে এই প্রথম দেখলাম। ওদের ঝরে পড়া পালকের কয়েকটা সংগ্রহ করব আমি," বলেই সে দিক লক্ষ করে করে দ্রুত বেশ কিছুটা উঁচু জায়গায় উঠে গেল শুভলক্ষ্মী। দেখাদেখি পঞ্চুও গেল।

বাচ্চু, বিচ্ছু, সুকন্যাও যাওয়ার উপক্রম করছিল। ওরা বাবলুর দিকে তাকাল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিন জনেই ওদের দিকে লক্ষ রাখছিল। হঠাৎই কী যে হল! ডানা ঝটপটিয়ে উধাও হল ময়ূরের দল!

ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল শুভলক্ষ্মী! সেই সঙ্গে শোনা গেল পঞ্চুর আর্তনাদ!

কুঞ্জা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও একটা খারাপ কিছু ঘটেছে। না হলে তো চেঁচিয়ে উঠবে না শুভলক্ষ্মী। আর পঞ্চুও আর্তনাদ করবে না।"

বাবলু তখন জোর গলায় ডাকল, "পঞ্চু! পঞ্চু! পঞ্চু..."

কী হল! কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারল না কেউ।

ও দিকে শুভলক্ষ্মী আর পঞ্চুর আর্তনাদ ক্রমেই মিলিয়ে যেতে লাগল দূর থেকে দূরে। আর কোনও চিন্তা-ভাবনা নয়। বাবলু সবাইকে নির্দেশ দিল ওদের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

কুঞ্জা, মালিজা, মাতনও তির-ধনুক হাতে ছুটে এল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই সঙ্গ নিল বাবলুর। সেই সঙ্গে এখানকার এরাও।

উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ধরে যখন সেই ময়ূরবিহারে এসে পৌঁছোল ওরা, দেখল দলে দলে

ভালুক এসে পুরো অঞ্চলটার দখল নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু শুভলক্ষ্মীর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

বাবলুর হাতে তখন পিস্তল।

তা দেখে শিউরে উঠল কুঞ্জা। বলল, "খবরদার, গুলি চালিয়ো না। তা হলে দারুণ খেপে যাবে ওরা। দেখছ তো, একটা-দুটো নয়, প্রায় দলবদ্ধ হয়ে এসেছে ওরা।
হঠাৎই কিসের একটা ঝটকা খেয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে বিপজ্জনক ভাবে গড়িয়ে পড়ল বাবলু। হাতের পিস্তল হাতেই রইল। কিছুই করতে পারল না। শুধু পিস্তলটা হাতছাড়া হল না, এটাই যা রক্ষে।

মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কিছু ক্ষণের জন্য সম্বিৎ হারিয়েছিল বাবলু। তার পর একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসতেই, পঞ্চু কোথা থেকে যেন গুটি গুটি এসে ওর পায়ের কাছে কুঁই কুঁই করতে লাগল। তবু ও অস্ফুট ভাবে বলল, "তুই বেঁচে আছিস পঞ্চু?

বেঁচে থাক। শুভলক্ষ্মী কই?"

শুভলক্ষ্মী একটু দূর থেকে কিছুটা কান্নার ভঙ্গিতে বলল, "আমি এখানে। আমাকে বাঁচাও।"

বাবলু তখন কোনও রকমে সোজা হয়ে আরও একটু গর্তের মতো জায়গায় এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে টেনে তুলল ওকে।

এত ক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল বেচারি। তার পর অতি কষ্টে বলল, "পঞ্চুর অনেক দয়া, ও আমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে চলে যায়নি। ওর জন্যই আমি প্রাণে বাঁচলাম। না হলে আমাকে জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়ে খেত। কিন্তু তুমি কী করে জানলে আমি এখানে আছি?"

"আমি না-জেনেই এসে পড়েছি এখানে। তোমার আর পঞ্চুর চিৎকার শুনে ওই ময়ূর-মহলে আসতে গিয়েই সম্ভবত ভালুকের ধাক্কা খেয়ে এখানকার বিপজ্জনক ঢালে গড়িয়ে পড়ি। তার পর তোমারও যা অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা।"

"এখন তা হলে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কী ভাবে?"

"এখান থেকে বেঁচে ফেরার বা মুক্তি পাওয়ার কোনও রাস্তাই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। জায়গাটা এমনই পিছল যে, একে অতিক্রম করে উপরে ওঠা একেবারেই অসম্ভব।"
বাবলু তখন ওর ফোনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চেষ্টাও বৃথা হল। ফোনে কোনও টাওয়ার পাওয়া গেল না। তাই নীরব রইল ফোন।
শুভলক্ষ্মী বলল, "এই ভাবে এখানে পড়ে থাকা কতটা বিপজ্জনক, তা জানো?"

"জানি। মৃত্যু যে সন্নিকটে, তা-ও বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি।"

এমন সময় অনেক উঁচু জায়গা থেকে একটা টর্চের আলো গায়ে পড়তেই আশার আলো দেখতে পেল ওরা।

বাবলু হাঁক দিয়ে বলল, "আমরা এখানে-এ-এ।"

পঞ্চুও সাড়া দিল 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে।

কুঞ্জার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল এ বার। বলল, "আমরা না যাওয়া পর্যন্ত কোনও ভাবেই উপরে ওঠার চেষ্টা কোরো না। আমি সময় বুঝে ব্যবস্থা নেব।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "তা হলে কি সারা রাত আমরা ও ভাবেই পড়ে থাকব এখানে?"

"তা কেন? চেষ্টা তো আমরা চালিয়ে যাবই। তোমরা যে এই মরণ-খাদে আছ, সেটা যখন আমরা জানতে পেরেছি, তখন সুযোগ-সুবিধে মতো তোমাদের আমরা উদ্ধার করবই। ইতিমধ্যে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তোমাদের আর সব বন্ধুদের..."

হঠাৎই কথা বন্ধ হয়ে গেল কুঞ্জার। টর্চটাও খসে পড়ে গেল হাত থেকে। এখন শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

শুভলক্ষ্মী বলল, "এ ভাবে হার মানতে আমি রাজি নই। যে ভাবেই হোক টর্চটাকে আগে উদ্ধার করতে হবে," বলে বুকে হেঁটে খানিক এগোতেই পঞ্চু তৎপর হয়ে এগিয়ে গেল সে দিকে। কিন্তু শুভলক্ষ্মী পারল না। আবার সেই গড়ানে পাথরের উপর ভর করতে গিয়ে হড়কে নেমে এল। আর বাবলুও ওকে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে গড়িয়ে পড়ল অন্য দিকের একটি ঢালে। এ দিকটা পিচ্ছিল নয়। তবে বড় বেশি গড়ানে। বেশ কিছু গাছপালাও আছে। তাই এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেল একটা বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। আর তখনই এক দল রোমশ ভালুক এসে গর্জন করতে করতে ঘিরে ধরল ওর চার পাশ। নিরুপায় বাবলু নিজেকে রক্ষা করার জন্য ওই সময়টুকুর মধ্যেই একটা শক্ত লতাকে অবলম্বন করে আরও অনেকটা নীচে নেমে গেল।

ভালুকের দল পিছু হটল এ বার।

বাবলু যেখানে নেমে এল, সেই জায়গাটা ওর পক্ষে অনেক নিরাপদ। কিন্তু এখানে ও একেবারেই অসহায়। ওর দলের কেউ নেই। পঞ্চু নেই। অতএব কী যে করবে ও, কিছুই ভেবে পেল না। তা ছাড়া ভালুকের কবল থেকে রক্ষা পেলেও সাপ, বাঘ এ সবের উপদ্রব তো হতেই পারে। তায় জায়গাটা দারুণ সংকীর্ণ।

কত ক্ষণ ও ওই ভাবে ছিল, তা মনে নেই। তবে রাত যে ক্রমশ বাড়ছে, তা ও বেশ বুঝতে পারছে। এই ভাবে সারাটা রাত যে কী করে কাটাবে ও, তা কিছুতেই ভেবে পেল না। এ দিকে ও যতই সাহসী হোক না কেন, তবু ভয় আর আতঙ্ক ওকে যেন ক্রমশ গ্রাস করে নিল। ওর যদি ওই অবস্থা হয়, তা হলে শুভলক্ষ্মীর এখন কী অবস্থা? এই সব ভেবে ওর স্থির বুদ্ধিটাও যেন লোপ পেতে লাগল। ও এখন না সজ্ঞানে, না অজ্ঞানে!

কত ক্ষণ এই ভাবে কাটল তা বুঝতেই পারল না ও।

হঠাৎই এক জায়গা থেকে একটু আলোর আভা পেয়ে বাঁচার সম্ভাবনা দেখতে পেল।

কে? কে এই ভাবে আলো ফেলল? তবে কি শুভলক্ষ্মী কোনও ভাবে নিজেকে উদ্ধার করে বাবলুর খোঁজ নিচ্ছে? কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব!

বাবলু এক বার জোর গলায় ডেকে উঠল, "পঞ্চু-উ-উ।"

কেননা পঞ্চুই তো টর্চের সন্ধানে গিয়েছিল। এই ডাকে কাজ হল। খুব কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে পঞ্চুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ভৌ-ভৌ-উ-উ।'

ব্যস। ভয়-ভীতির ভাব দূর হল বাবলুর। একটু পরেই মশালের জোরালো আলোয় অনেকটা অন্ধকার দূর হলে, পুরুষ কণ্ঠের স্বর শোনা গেল, "আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদিও আপনি এখনও প্রচণ্ড বিপদের মুখে, তবুও চান্দেরকে আমি কথা দিয়েছি এই বিপদের মুখ থেকে আপনাকে আমি যে ভাবেই হোক ফিরিয়ে আনব।"

এত ক্ষণে অনেকটা আশ্বস্ত হল বাবলু।

পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' শব্দও কানে আসতে লাগল। দূর থেকে কাছে আরও কাছে এগিয়ে এল পঞ্চুর স্বর। ও দিকে আলোও জোরালো হয়ে এল। এক সময় কে যেন এক জন এসে শক্ত করে ওর একটা হাত চেপে ধরল। বলল, "আমি রাকা। এই জঙ্গলেই গুহাবাসী হয়ে দীর্ঘ দিন রয়েছি আমি। কাছেই আমার ঠিকানা। চলুন আমার সঙ্গে। রাতে গুহাতেই থাকবেন। ছোট্ট গুহা, তবে কুলিয়ে যাবে।"

বাবলুও কোনও রকমে তাকে অবলম্বন করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল।"

"আগেই উদ্ধার করেছি তাকে। সে এখন আমার জিম্মায়।"

এর পর প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বাবলুকে নিয়ে চলল রাকা ওর আস্তানার দিকে। যেতে যেতে বলল, "জায়গাটা সংকীর্ণ বলেই প্রাণে বেঁচেছেন। না হলে এত ক্ষণে হয় ভালুকে ছিঁড়ে খেত, নয়তো বাঘের পেটে যেতেন।"

যেতে যেতেই বাবলু বলল, "আপনার সঙ্গে চান্দেরের যোগাযোগ হল কী করে?"

"কুঞ্জার মারফত।"

এই ভাবে এক সময় কথা বলতে বলতে ওরা একটা ঘেরাটোপের মধ্যে রাকার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছোল। তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটা অংশের পিছনে, ওর গুহায় প্রবেশ করল বাবলু। ওকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল শুভলক্ষ্মী। বলল, "শুধু আমার হঠকারিতায় এই ভাবে বিপদের মুখে পড়ে গেলে তুমি। এই নাও তোমার টর্চ। পঞ্চুর সাহায্যে এটা ফিরে পেয়েছি আমি।"

বাবলু বলল, "এই টর্চ আমারও নয়। ওটা কুঞ্জার।"

যা-ই হোক, ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে বাবলু এসে শুভলক্ষ্মীর পাশে একটু জায়গা করে নিল।

এর পর রাকা ও তার বৌ কুসমা খুব যত্ন করতে লাগল ওদের। কুসমা বলল, "এখানে যখন এসে পড়েছ, তখন আর কোনও ভয় নেই তোমাদের। কাল সকাল হলেই ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যাবে তোমরা। এখন একটু চা খাও। পরে ডাল-রুটি খাবে।"

নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় পেয়ে বাবলুর দুশ্চিন্তা দূর হল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই ওর চোখে পড়ল গুহার মধ্যে এক জায়গায় জড়ো করা আছে বেশ কয়েকটি প্রমাণ সাইজের হাতির দাঁত।

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইল, "এগুলো এখানে কী ভাবে এল?"

কুসমা বলল, "এগুলো বিক্রির জন্য রাখা আছে। বুনো হাতিরা মরে গেলে আমরা তাদের দেহাংশ ও বিশেষ করে দাঁত সংগ্রহ করি। উপযুক্ত দাম পেলে বেচেও দিই। তবে কোনও ভাবেই জ্যান্ত হাতিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলি না আমরা। এই ভাবেই উপার্জন করি আমরা। তাই গুহাবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছি। না হলে আমাদেরও তো ইচ্ছে হয়,

দলমাতেই গ্রামে গিয়ে সবার সঙ্গে থাকি। যাই হোক, এ সব কথা যেন বোলো না কাউকে।”

বাবলু বলল, “আপনারা আমাদের আশ্রয়দাতা। আপনাদের ক্ষতি হয়, এমন কিছু আমরা করতে পারি?”

কুসমা এ বার ওদের জন্য ডাল-রুটির ব্যবস্থা করতে করতে গল্পে মাতল। তার পর শুভলক্ষ্মীর সঙ্গে বাবলুর পরিচয়ের সূত্র জানতে চাইল। কেন তারা পঞ্চু নামের এই দেশি কুকুরটার ভরসায় বিপজ্জনক এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, তা-ও জানতে চাইল। বাবলু এক এক করে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিল ওর।

শুনে অবাক হয়ে কুসমা বলল, “কী গো তোমরা! পরের মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য এত বড় একটা বিপদের ঝুঁকি নিলে?”

শুভলক্ষ্মী তখন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপারে সব বলল কুসমাকে।

কুসমা বলল, “ধন্যি ছেলে-মেয়ে বটে তোমরা। তবে ওই মেয়ে দু’জনের সন্ধান আমি দিতে পারি তোমাদের।”

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে আশাবাদী হয়ে বলল, “কোথায়! কোথায় আছে তারা?”

“এখনও আছে কি না বা কী অবস্থায় আছে, তা বলতে পারব না। তবে মনে হয় একটু চেষ্টা করলেই খোঁজ পাবে তোমরা। দারুণ সুন্দরী দু’জন মেয়ে। দু’জনকেই আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থা দেখেছি।”

“আমরা যাব। যে ভাবেই হোক, তুমি নিয়ে চলো আমাদের।”

“নিয়ে যাব। তবে এখনই তো নয়, আগে সকালটা হতে দাও। খুব একটা সহজ পথ নয় কিন্তু। জায়গাটা হল গব্বর কেভ। দারুণ বিপজ্জনক জায়গা!”

“যত বিপজ্জনক হোক না কেন, ওখানে আমাদের যেতেই হবে।”

ইতিমধ্যে ডাল-রুটি হয়ে গেছে। রাকা, কুসমা দু’জনেই হাত লাগাল ওদের খাওয়ানোর কাজে।

ওরা কোনও রকমে সেই ডাল-রুটি গলাধঃকরণ করে বলল, “আমার মনে হচ্ছে যাদের

খোঁজে এসেছি আমরা, ওরা তারাই।"

কুসমা বলল, "এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। এখন একটু কষ্ট করে ঘুমিয়ে নাও। কাল সকাল হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।"

যাই হোক এখানকার এই পরিবেশে ঘুম আসা অসম্ভব যদিও, তবুও ওরা দু'জনে দু'দিকে দুটো চট পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদে ঝলমল করছে চার দিক।

রাকার ডাকে উঠে বসল দু'জনেই।

সংকীর্ণ সেই গুহাটা যত বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, ততটা নয়। পঞ্চু তবুও গুহার মুখে নিরাপদ দূরত্বে থেকে, বলতে গেলে জেগেই ছিল সারা রাত।

কুসমা বলল, "আর কোনও ভয় নেই তোমাদের। রোদ উঠলে হাতি ছাড়া অন্য কোনও জন্তুর আবির্ভাব বড় একটা হয় না।"

রাকা বলল, "তবুও বিশ্বাস হয় না। দলমার অরণ্যে সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ওদের একটু চা-মুড়ি খাইয়ে দাও।"

কুসমা বলল, "আমার কাছে সুজি আছে। আমি বরং চট করে একটু হালুয়া তৈরি করে দিচ্ছি। তাতে আর যাই হোক, ওদের পেটটা অন্তত ভরবে।"

অতএব কিছু ক্ষণের মধ্যেই জলযোগ শেষ করে কুসমার সঙ্গ নিয়ে খাড়াই পার্বত্যভূমিতে রওনা হল ওরা। গত রাতে যা অতি ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, এখন কিন্তু অতটা বলে মনে হল না। যদিও অনায়াসে ওঠা গেল না, তবুও ঢাল পেরিয়ে উপরে উঠতে রীতিমতো সক্ষম হল ওরা।

আর উপরে উঠতেই দেখা হয়ে গেল সকলের সঙ্গে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে এসে দারুণ আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওদের।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "এ ভাবে কোনও অভিযান করতে যাওয়া ঠিক নয়। যথেষ্ট হয়েছে। চলো বাবলুদা, আর অভিযানের দরকার নেই। এ বারের এই অভিজ্ঞতা নিয়েই ফিরে যাই চলো।"

বাবলু বলল, “তা হয় না রে। এত অভিযানের পর এই ভাবে পিছু হটে যাওয়া কি গৌরবের হবে আমাদের?”

বাচ্চু বলল, “তবে কি মরণপণ লড়ব আমরা? এটা হিংস্র জন্তুদের এলাকা।”

বাবলু বলল, “সে কথা ঠিক। হয়তো বা ফিরেও যেতাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আশার আলো দেখতে পেলাম। কুসমার মুখে শুনলাম, এখানে পাহাড়ের উচ্চ স্থানে গব্বর কেভ না কী যেন একটা আছে মনে হয়। সেখানে গেলেই খোঁজ মিলবে জয়ন্তিকা ও তানিশার।”

শুনেই চমকে উঠল কুঞ্জা। বলল, “ওই গব্বর এক বিপজ্জনক গুহা। না জেনে ওর ভিতরে ঢুকলে, যে কোনও মুহূর্তে অতলে তলিয়ে যেতে হবে হঠাৎ করেই। ওখানে বা ওর আশপাশে যারা থাকে, তারা অতি হিংস্র। তাই ওই জায়গাটা দারুণ বিপজ্জনক।

শুধু তা-ই নয় ওদের ওরা অন্যত্র পাচারও করে দিতে পারে।

হয়তো দিয়েওছে।”

বাবলু, বিলু, ভোম্বল সবাই এক জোট হয়ে বলল এ বার, “তা হলে তো ওখানে আমাদের যেতেই হবে।”

কুঞ্জা মালিজা দু'জনেই বলল, “তবে এই ভাবে নয়। ওখানে যেতে হবে দলবল বেঁধে। এখন সর্বাগ্রে আমাদের আস্তানায় চলো। স্নান-খাওয়া সেরে তৈরি হও। আমরাও সেই মতো ব্যবস্থা করি। তার পর দলবদ্ধ হয়ে যাব সবাই। তবে ইতিমধ্যে ওদের পাচার-কার্য যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কিছুই আর করা যাবে না।”

“কেন করা যাবে না? প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নেব আমরা। চান্দের ভাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন আমাদের।”

অতএব তখনকার মতো সকলে ঘরে ফেরারই সিদ্ধান্ত নিল।

এখানকার সবাই, সেই সঙ্গে কুসুমাও রয়ে গেল ওদের সঙ্গে। কেননা গব্বরের পথ-প্রদর্শক আরণ্যক কুসমাই। ওর মুখেই শুনল সবাই, রাকার সঙ্গে কুসমার কণ্ঠি বদলের বিবাহ মাত্র এক বছরের। ওই গব্বর থেকেই কুসমাকে উদ্ধার করে রাকা। কুসমার বাবা-মা নেই। একটি মাত্র ভাই। সে থাকে বহরাগোড়ায়। দূরের পথ। তাই দেখা-সাক্ষাৎও

নেই। যাই হোক, কুসমা ওদের সব রকম ভাবে সাহায্য করতে পারবে, এমন আশ্বাসও দিল।

কথায় বলে, দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। তাই সবার প্রচেষ্টার খিচুড়ি আর ভাজি তৈরি হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সবাই পেট ভরা খাওয়া খেয়ে চাঙ্গা করে নিল নিজেদের।

এখন আর কোনও বিশ্রামের অবকাশ নেই। নিমেষের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল সবাই।

এখানে এক অরণ্য-মধ্যে স্থানীয় দেবী কালিকা আছেন। সংস্কারবশত সবাই সেই দেবীর চরণে প্রণিপাত করে সামান্য প্রসাদ মুখে দিল।

বেলা এখন একটা।

কুসমা বলল, "আর দেরি করে লাভ নেই। এত ক্ষণে হয়তো বুনো হাতির দল নেমে এসেছে চার দিক থেকে। অতএব সবাই খুব সাবধানে চার দিকে নজর রেখে পথ চলবে। সদাসতর্ক থাকবে।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "বাঘের দেখাও তো মিলতে পারে?"

"মিলতে পারে নয়, মিলবেই।"

অতএব সবাই রীতিমতো তৈরি হয়েই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রওনা হল গভীর জঙ্গলের দিকে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়া কুড়ুল, মশাল, তির-ধনুক সহ ধারালো অস্ত্র সকলের হাতে হাতে।

কুসমা সবার আগে। তার সঙ্গ নিয়ে কুঞ্জা, মালিজা, মাতন। সকলের শেষে সুকন্যা ও শুভলক্ষ্মী। বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু, বিচ্ছু এদেরই দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।
আর পঞ্চু সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলার মতো। সে কখনও সকলের আগে চলে যায়। কখনও বাবলুর ধমক খেয়ে দলের মধ্যে ফিরে আসে।

হঠাৎই অনেকটা উঁচুতে ওঠার পর হুঁশিয়ারি দিল কুসমা। বলল, "ওই দেখো, দলবদ্ধ হয়ে ভালুকের দল এগিয়ে আসছে। অতএব খুব সাবধান। যে যেখানে পারো, পাহাড়ের ফাটলে অথবা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়ো। ওরা বিদায় না-হওয়া পর্যন্ত কেউ টুঁ শব্দটি কোরো না।"

এমত অবস্থায় কে যে কোন দিকে লুকোবে, কিছু ঠিক করতে পারল না। এ দিকে ঘটে গেল আর-এক ভয়ানক বিপর্যয়। হঠাৎ কোথা থেকে একটা চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চুর উপর। পর ক্ষণেই চোখের পলকে সে উধাও। এই দৃশ্য কি চোখে দেখা যায়?

বাবলু বলল, "সবাই তোরা সাবধানে থাক। হয় আমি পঞ্চুকে নিয়ে ফিরব, নয়তো শেষ করে দেব নিজেকেই।"

বাবলু আর লুকিয়ে না-থেকে ওর পিস্তলটা উদ্যত করেই বাঘের পথ অনুসরণ করল। খুব বেশি দূর অবশ্য যেতে হল না ওকে। চিতার চিৎকার ও আর্তনাদে বনভূমি কেঁপে উঠতেই পথের সন্ধান পেয়ে গেল বাবলু। গিয়ে দেখল যা অবিশ্বাস্য, এখানে তা-ই ঘটেছে। অর্থাৎ চিতাটার বুকে উঠেই পঞ্চু ভৌ ভৌ করে তড়পাচ্ছে। বাঘের প্রিয় খাদ্য হল কুকুর। এখানে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। কুকুর বাঘের বুকে উঠে দাপাদাপি করছে। যা ফটো তুলে না-দেখালে কেউ বিশ্বাস করবে না। কী করে এমন হল!

এই মুহূর্তে বাবলু যে কী করবে, কিছু ভেবে পেল না। তত ক্ষণে কুসমা মশাল নিয়ে ছুটে এসেছে।

বাবলু বলল, "আর সব কই? ওরা কোথায়? ওদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

কুসমা বলল, "ভালুকের নজর এড়িয়ে ওরা আসতে পারছে না।"

বাবলু তখন গায়ের জোরে টেনে নামাল পঞ্চুকে। নামিয়ে দেখল বরাত-জোরে বেঁচে গেছে পঞ্চু। চিতাটার একটা পা গুলিবিদ্ধ হয়েই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, জখম হয়েছিল অনেক আগেই। আর সাহসী পঞ্চু প্রাণের ভয় না-করে ওর দুটো পায়ের চালনায় চিতাটার চোখ দুটোই দিয়েছে উপড়ে।

অতএব বাধ্য হয়ে পঞ্চুকে ছেড়ে আর্তনাদ করতে করতে স্থান ত্যাগ করল চিতাটা।

এই সবের মাঝখানেই কুঞ্জার সাড়া পেয়ে কুসমা বলল, "আর ভয় নেই। আমি এখনই ডেকে আনছি সবাইকে। তুমি এখানেই থাকো," বলে দ্রুত ওদের ফিরিয়ে আনতে গেল কুসমা। গব্বরও আর বেশি দূরে নয়।

গব্বর মানে বড় গুহা। গব্বর। সর্বত্রই বলে গব্বর। বাবলু যখন পঞ্চুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঠিক তখনই কে যেন এক জন পিছন দিক থেকে এসে বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরল।

বাবলু বলল, "কে তুমি?"

উত্তর এল, "যে কিনা তোমারই মতো এক জনের প্রতীক্ষায় ছিল, আমি সে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই গভীর অরণ্যে তুমি এখানে কী ভাবে এলে?"

"যে ভাবে তুমি বা তোমরা এসেছ। তুমি কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কেউ? আর এই কি পঞ্চু?"

"কী করে বুঝলে?"

"ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে। বার বার তোমার গলায় পঞ্চু নামটা আমার কানে আসছিল। তাই আমি অনেক আশা নিয়ে কাছাকাছিই ওত পেতে ছিলাম।"

"কিন্তু এখানে তুমি কী করছিলে?"

"সে সব কথা পরে হবে। আপাতত যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তা হলে এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে চলে এসো। না হলে মরবে। এটা তোমার সেই মিত্তিরদের বাগান নয়। এটা হিংস্র জন্তুতে ভরা ভয়াবহ দলমা ফরেস্ট।"

"তা তো আমিও বুঝলাম। এখন বলো তুমি কে?"

মেয়েটি দারুণ রেগে বলল, "জাস্ট লাইক আ ফুল! প্রাণ বাঁচাতে আগে আমার ডেরায় এসো, তখনই সব বলব।"

বাবলু আর কোনও কথা না-বলে মেয়েটির পিছু নিল।

একটার পর-একটা বড় পাথরের টিলা পেরিয়ে, কখনও বা গাছের ডাল ধরে অতিক্রম করল জায়গাটা। মাঝে মাঝে বাবলুর হাত ধরেও টেনে তুলল মেয়েটি।

পঞ্চুকে অবশ্য ওই ভাবে উঠতে হল না।

এক সময় আরও উঁচুতে উঠে পড়লে মেয়েটি বলল, "এখন তুমি কোথায় এসেছ জানো?"

বাবলু বলল, "তোমার মুলুকে। এর আগে কি আমি বা আমরা কেউ এসেছি এখানে?"

মেয়েটি বলল, "এর নাম গব্বর। অন্তহীন গুহা এটা। তবে এটাই মুখ নয়। মাঝের একটা অংশের ফাটল। আমি আজই আবিষ্কার করেছি এটা। যা-ই হোক, এখন এর মধ্যেই আত্মগোপন করো। ভাগ্যে বুনো হাতির দল, ভালুকের দল ঘিরে ফেলেছিল জায়গাটাকে, তাই আমি পালাতে গিয়েও পিছু হটলাম।"

বাবলুর আগে পঞ্চুই ফাটল গলে ভিতরে ঢুকল প্রথমে। তার পর কুঁই কুঁই করে ডাক দিয়ে সামনের পা দুটো নাড়াতে লাগল।

অতএব পঞ্চুকে ভরসা করে কোনও রকমে কাত হয়ে মেয়েটি আগে ঢুকল। তার পর সেই ফাটল বেয়ে ঢুকল বাবলুও। জায়গাটা এমনই যে, এখানে সাপ-বেজি-বিছে ছাড়া অন্য কিছুর ঢুকে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

দিনের আলো তখনও একেবারে মুছে যায়নি বনবাসর থেকে।

বেশ কিছুটা দূর থেকে কুসমার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সে বার বার ডেকে চলেছে, "বাবলু, তুমি কোথায়? পঞ্চুকেও তো দেখতে পাচ্ছি না। দলের সবাই ঠিক আছি। জন্তুরা ঘিরে রেখেছে, তাই বেরোতে পারছি না। তুমি কি একা ওই গুহায় পৌঁছে গেছ?"

বাবলু ফাটল থেকে মুখ বের করে বলল, "আমি কোনও রকমে প্রাণে বেঁচেছি। তোমরা সাবধানে থেকো। নিরাপদ দূরত্বে এসে আমার নাম ধরে ডেকো, আমি বেরিয়ে আসব।

এখন আমি গব্বরের অন্য দিকে আছি। একটি মেয়ে আমাকে বাঁচার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"

"সেই মেয়েদের কেউ নয় তো?"

"জানি না! এখনও পরিচয় হয়নি।"

এমন সময় 'হ্যাররো' করে একটা গর্জন কানে আসতেই বুক যেন শুকিয়ে গেল।

বুনো হাতির দল যে আশপাশেই এলাকা ঘিরেছে, তা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারা গেল। অতএব নিশ্চিন্দি।

মেয়েটি বলল, "এই ভাবে জীবনে কখনও যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি বা তোমার মতো আর এক জনও কেউ না-এলে, আমার জীবন বিষময় হয়ে যেত।"

বাবলু বলল, “সবই তো বুঝলাম, কিন্তু কে তুমি?”

“একটি মেয়ে। নাম বললে চিনবে? আমার নাম জয়ন্তিকা ভাট।”

“ওই সব ফাজলামি না-করে বলো, তানিশা যাদবের খবর কী? সে কোথায়?”

চমকে উঠল জয়ন্তিকা। বলল, “স্ট্রেঞ্জ! এ নাম তুমি জানলে কী করে?”

“তোমাদেরই বান্ধবী শুভলক্ষ্মীর মুখ থেকে শুনেছি। তোমরা পঞ্চ বান্ধবী মিলে ডিমনা লেকে এসেছিলে। তার পর থেকেই বাঘ অথবা ভালুকের তাড়া খেয়ে যে যে-দিকে পেরেছ, পালিয়েছ। শুধু তোমাদের দু’জনেরই কোনও খোঁজখবর নেই। বাড়ির সবাই কান্নাকাটি করছে। এমত অবস্থায় শুভলক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে এসে তোমাদের ব্যাপারে জানাল। আর অনুরোধ করল, যদি আমি আমার পাণ্ডব গ্রুপ নিয়ে একটু চেষ্টা করি, তোমাদের সন্ধান পাওয়ার। তাই অনেক ঝুঁকি নিয়েই এ পথে এসেছি আমরা। এখানে আসতে গিয়ে কাল পঞ্চু, আমি ও শুভলক্ষ্মী একটি গাড্ডায় পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। সারা রাত পড়ে ছিলাম সংকীর্ণ একটি গুহার মধ্যে। কুসমা নামে একটি মেয়ে খুব সেবা-যত্ন করেছে আমাদের। ওর বর রাকা অত্যন্ত ভাল মানুষ। যা-ই হোক, আজ সকালেই আমরা নতুন উদ্যম নিয়ে তোমাদের উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।”

জয়ন্তিকা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল এ বার। বাবলুকে বলল, “আগে বলো, তুমি ভগবান কি না?”

বাবলু বলল, “ভগবান আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি ভগবান নই। তবে আমি ভাগ্যবান। তা না হলে এই ভাবে তোমার দেখা আমি পেতাম না। এখন বলো, তানিশার খবর কী?”

“উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে ও চলচ্ছক্তিহীন। ভেবেছিলাম ওকে সঙ্গে নিয়েই পালাব। কিন্তু তা আর পারলাম কই? তাই ওদের নজর এড়িয়ে গা ঢাকা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পথ যে কোন দিকে, তার কোনও হদিস পাচ্ছিলাম না। তাই বাঁচার জন্য এই গোপন আস্তানাটিই বেছে নিয়েছিলাম।”

“তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি পালাতেই বা চাইছিলে কেন?”

“ওদের মতলব আমার ভাল মনে হচ্ছিল না। আমি অনেক বার বলেছিলাম আমাকে

ডিমনায় নামিয়ে দিতে। ওরা বারে বারে আমাকে তানিশার দোহাই দিতে লাগল। বলতে লাগল, 'ওকে এই ভাবে ফেলে রেখে তোমার চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?' আমি যত বলি, 'তা হলে তোমরা ডিমনায় যে হোটেলে ছিলাম, সেখানেই খবর দাও,' ওরা সে কথাও শুনছিল না। পরে বুঝতে পারলাম, ওরা ভিতরে ভিতরে কোনও বদ মতলব আঁটছে। তানিশাই চুপি চুপি এই কথা বলেছে আমাকে। সে জন্যই সুযোগ বুঝে সবার নজর এড়িয়ে পালাচ্ছিলাম আমি। এমন সময় দেবদূতের মতো তোমার দেখা পেয়ে বর্তে গেলাম।"

বাবলু বলল, "আর ভয় নেই তোমাদের। দু'জনকেই আমরা উদ্ধার করব। এক বার শুধু আমার বন্ধুদের ডাক পেতে দাও। কেননা আমার দলবল সশস্ত্র।"

জয়ন্তিকা এ বার বাবলুকে ছেড়ে পঞ্চুর দিকে নজর দিল। বলল, "তুমি তো সাধারণ কেউ নও, তুমি হলে ধর্মরাজ। এই যুদ্ধে তোমাকেও আমি খুব বেশি ভরসা করি। বাবলুর শক্তি তুমি। আমাকে আমার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার উপরও অনেক আস্থা রাখি আমি।"

একটু আদর পেলেই পঞ্চু গলে যায়। তাই জয়ন্তিকার কোলে মাথা রেখে 'গোঁ-ও-ও' করে গড়িয়ে পড়ল আনন্দে।

এমন সময় দুম দাম পটকা ফাটার শব্দে চমকে উঠল সকলে।

বাবলু গলায় জোর এনে বলল, "আর ভয় নেই। আমাদের ওরা এসে গেছে। না হলে এখানে পটকা ফাটাবে কে?"

জয়ন্তিকা বলল, "বাইরে একটু একটু আলোর আভাসও পাওয়া যাচ্ছে।"

কুঞ্জা ও কুসমা দু'জনেরই ডাক শোনা গেল তখন, "তোমরা কি এখনও এখানেই আছ? বাবলু! পঞ্চু!"

সবার হয়ে জোর গলায় সাড়া দিল পঞ্চু, 'ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ।'

অতএব আর গুহাবাস নয়। সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে শরীর কাত করে বাবলু, জয়ন্তিকা দু'জনেই আত্মপ্রকাশ করল।

শুভলক্ষ্মী ওদের দলেই ছিল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল জয়ন্তিকাকে। আদরে, সোহাগে

ভরিয়ে দিয়ে বলল, "এ আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি না তো? কিন্তু আর এক জন? সে কোথায়?"

জয়ন্তিকা বলল, "সে-ও আছে। তবে আমাদের সঙ্গে নেই। সে আছে গব্বরে। বড় গুহায়। তাকে আনতে যেতে হবে। সে খুব জখম অবস্থায় আছে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা বলল, "যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, পারলে পাঁজাকোলা করে হলেও নিয়ে যাব ওকে।"

কুঞ্জার সঙ্গে মালিজা, মাতনও ছিল। ওরা বলল, "কয়েকটা দড়ি পেলে ঠিকই আমরা কব্জা করে ফেলব ওকে। লাঠি তো আছেই আমাদের কাছে। প্রয়োজনে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "তা হলে গো অ্যাহেড। চলো সবাই, গহ্বর না গব্বর কোথায় যেন যাবে।"

কুঞ্জা বলল, "আমরা তার কাছাকাছিই আছি। ওই দেখো কাঁটা গাছের ঝোপ দিয়ে ঘেরা গব্বরের মুখ।"

সবাই এ বার মশালের আলোয় চার দিক আলোকিত করে অনায়াসে গব্বরের মুখে গিয়ে পৌঁছোল।

জয়ন্তিকা ছুটে গিয়ে তানিশাকে জড়িয়ে ধরতেই, তানিশা ডুকরে কেঁদে উঠল ওকে দেখে। বলল, "তুই তা হলে সত্যিই ফিরে এলি? আমি কি এখান থেকে মুক্তি পাব এ বার?"

"পাবি। এখন পাণ্ডব গোয়েন্দারা আমাদের সহায়।"

"পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

"হ্যাঁ। বিপদ কালে অলৌকিক ব্যাপারও কিছু ঘটে যায়।"

গুহায় দু'জন জোয়ান পুরুষ ও মহিলাও ছিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে প্রমীলা বাহিনীকে দেখেই ওরা বুঝে গেল, এরা চান্দেরের লোক। তাই আর কোনও রকম বাধা সৃষ্টি করল না। বরং ওদেরই এক জন তানিশাকে একটা থলির বস্তায় ভরে পিঠে বহন করে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে এল। তার পরে আর এক জন সেটা নিয়ে পৌঁছে দিল কুঞ্জার ঘরে।

ভয়েই হোক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, এই কাজ করল ওরা। লোকটি হাত জোড় করে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল চোখের পলকে। তবে যাওয়ার আগে এক জনের কাছ থেকে একটি জ্বলন্ত মশাল চেয়ে নিল আত্মরক্ষার জন্য।

যা অসম্ভব, তা যে সত্যিই সম্ভব হয় মনের জোর এবং উদ্যম থাকলে, এ ক্ষেত্রে সেটাই প্রমাণ হল।

প্রথমে ওরা কুঞ্জাদের ঘরে উঠলেও, পরে আরও কিছু শয্যার ব্যবস্থা হলে সবাই চলে এল বাবলুদের ঘরেই। আনন্দে এবং বিজয়-গৌরবে ওরা যে কী করবে, তা কেউ ভেবে পেল না।

বাবলু এ বার কুসমাকে বলল, "তোমার অবদান এদের দু'জনকে উদ্ধারের ব্যাপারে অনেক। আজ এসো, সবাই আমরা এক জোট হয়ে সারা রাত জেগে গল্প করি। তার পর কাল সকালে রওনা হব বাড়ির দিকে।"

ওদের এই কথাবার্তার ফাঁকেই উদয় হল চান্দের। বলল, "তোমরা তো অসাধ্য সাধন করেছ। এখন চুটিয়ে সবাই মিলে মাংস-ভাত খাও। দেশি মুরগির কোনও অভাব নেই আমাদের এখানে। কাল সকালে আমি তোমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমাদের একটি মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। যদিও মরণাপন্ন নয়, তবুও ডাক্তার দেখানো দরকার। ইতিমধ্যে আমি কিছু পেনকিলার নিয়ে এসেছি। খেয়ে বিশ্রাম নাও তোমরা।"

সত্যি, এই বনভূমে এমন সহৃদয় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। চান্দেরজি বিদায় নিলে জোর পিকনিক পর্ব শুরু হয়ে গেল ওদের। শুধু কুঞ্জা, মাতিজা নয়, মেয়েরা সবাই হাত লাগাল এই কাজে।

অনেক রাতে রান্না শেষ হলে দম ভর খেল সবাই। তার পর কেউ আর শয্যাগ্রহণ না করে, দলবদ্ধ হয়ে গল্পে মাতল। তবে ভোম্বল একটু ঘুমকাতুরে বলে, শোওয়া মাত্রই নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল সে। জোরে নাক ডাকলে পঞ্চু মাঝে মাঝে ওর কানের কাছে ভুক ভুক করে হুঁশ ফিরিয়ে দিতে লাগল ওর।
এই ভাবে একটা রাত কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে পাখ-পাখালির কলকূজনে মেতে উঠল বনভূমি। ওদের দুয়ারের সামনেই কয়েকটি ময়ূর এসে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সে কী দারুণ দৃশ্য! দেখে মন ভরে গেল।

একটু পরেই বেশ বড়সড় একটি গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন চান্দেরজি। বললেন, "এই অবস্থায় তোমাদের ওই বান্ধবীকে নিয়ে ট্রেনে যাওয়ার চেয়ে গাড়িতে যাওয়াই ভাল।

প্রয়োজনে যেখানে সেখানে গাড়ি থামাতেও পারবে। ট্রেনে যেটা সম্ভব নয়। গাড়িতে যথেষ্ট তেল আমি ভরিয়ে দিয়েছি। বাকিটা তোমরা..."

শুভলক্ষ্মী বলল, "সে ব্যবস্থা আমরাই করব। ওর জন্য কোনও অসুবিধে হবে না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এ বার সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিলে, শুভলক্ষ্মী জোর গলায় বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই তখন উচ্চ স্বরে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও ওর স্বাভাবসুলভ ভঙ্গিতে ডেকে উঠল 'ভৌ-ভৌ-ভৌ।'

প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটা যে এমন সুশৃঙ্খল ভাবে হবে, এটা ওরা কেউ কল্পনাও করেনি। আনন্দে নন্দিত হল সবাই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার মুহূর্তেই টাটানগরের সেই হোটেল ম্যানেজার এসে হাজির। বললেন, "এ কী! ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়ে কোথায় চললে তোমরা? আমি এখানে এলাম তোমাদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেব বলে। এখানে এখন জোর পিকনিক হবে। রাতে আমার হোটেলে থেকে কাল সকালে ঘরমুখো হোয়ো। এখন কোনও মতেই যাওয়া নয়।"

অতএব নামতেই হল গাড়ি থেকে।

ম্যানেজার বললেন, "যে কাজের জন্য তোমরা এসেছিলে, সে কাজের কত দূর কী হল?"

বাবলু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, "এই যে সেই নিখোঁজ মেয়েরা, জয়ন্তিকা ও তানিশা।"

চান্দেরজি বলল, "এদের নামের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও এরা যে এতই করিৎকর্মা, তা আমি ভাবতেও পারিনি। এই জন্যই এদের এত পরিচিতি। আপনার কথা মতো ওদের সাহায্য করার জন্য এখানকার বেশ কয়েক জন মেয়েকেও সঙ্গে দিয়েছিলাম। তবু তাদের নজর এড়িয়েই উদ্ধার-কার্য কী করে যে চালাল, এরা সেটা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, মেয়ে দুটো যে প্রাণে বেঁচেছে, এটাই আমার আনন্দ।"

ম্যানেজার এর পর তাঁর লোককে দিয়ে অনেক কচুরি, শিঙাড়া ও জিলিপি আনালেন। সেই সব খাওয়া হলে, শুরু হল চা-পর্ব। মেয়েরা এ বার জোর কদমে পিকনিকে মাতল। ম্যানেজার বললেন, "এখানে এসে আর যা-ই হোক, মনের আনন্দে তোমাদের ঘোরা হল না। এখন চলো, ডিমনার আশপাশে থেকে ঘুরিয়ে আনি তোমাদের।"

অতএব ম্যানেজারের বড় গাড়িতে এই এলাকার সর্বত্র ঘুরে দেখতে গেল সবাই। তানিশাই শুধু যাওয়ার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখাল না তার অসুস্থতার কারণে।

কথায় বলে এক দমে এক চক্কর। সেই ভাবেই চতুর্দিক ঘুরে দেখল ওরা। ফিরে যখন এল, বেলা তখন একটা।

ইতিমধ্যে সকলের ফোনে চার্জ দেওয়ার ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। তাই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আর বিচ্ছিন্ন রইল না কারও।

জয়ন্তিকা ও তানিশার বাড়ির লোকেরাও, যারা মেয়েদের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, একেবারে তারাও ফোন-মারফত অভিনন্দন জানাতে লাগল বাবলুকে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল তিনটে হয়ে গেল। এর পর দু'-দুটো গাড়ি নিয়ে ওরা চলে এল টাটা নগরের লজে। মালিক ওদের থাকার জন্য বেশ বড় বড় দুটো ঘর ছেড়ে দিলেন।

রাতেও এখানে গল্প-গুজব মন্দ হল না। তখনই ঠিক হল এখান থেকে সরাসরি হাওড়ায় না-গিয়ে, ওরা ঘাটশিলায় থেকে যাবে দু'-একটা দিন। সেই কবে ঘাটশিলা এসেছিল ওরা! তাই আর-এক বার পুরনো দিনের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে চাইল।

তবে জয়ন্তিকা রাজি হলেও তানিশা একদমই যেতে চাইল না। ওর আগ্রহী না হওয়ার কারণও আছে। প্রথমত, ভগ্ন স্বাস্থ্য। বেশি চলাফেরায় অক্ষম। দ্বিতীয়ত, মা-বাবার জন্য ওর মন খারাপ করছে খুব। তাই বাধ্য হয়েই ওকে বাদ দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তবে একা তো ছাড়া যাবে না ওকে। তাই জয়ন্তিকাও ওর সঙ্গে যাবে, এমন ব্যবস্থাই করা হল। ঠিক হল বাবলুরা ঘাটশিলায় নেমে গেলে, ওরা সেই গাড়িতেই বিদায় নেবে কলকাতার দিকে।

অবশেষে সকাল হল এক সময়। আর তখনই তানিশার বাড়ি থেকে ফোন এল এক সময়। ফোনে জানানো হল, “তোমরা যেন হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পোড়ো না। আমরাই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের আনতে। রাত বারোটায় গাড়ি ছেড়েছি আমরা। খুব সকালেই পৌঁছে যাব আশা করি।”

এর পর আর কথা নেই। সবচেয়ে নিরাপদ যাত্রা এবং দায়িত্বহীন। এ বার যা কিছু ঝক্কি, সব ওর বাড়ির লোকেরাই পোহাক।

এই সংবাদ শুনে সবচেয়ে খুশি হল জয়ন্তিকা। ও দ্রুত এসে শুভলক্ষ্মীর কানে কানে ফিস ফিস করে কী যেন বলে বাবলুকে বলল, “মি. হিরো, তানিশা যখন ওর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে চলেই যাবে তখন আর আমার তো যাওয়ার দরকার নেই। আমি তোমার দলের সঙ্গেই থেকে যাব। আসলে কী জানো, তোমার বা তোমাদের দলকে ছেড়ে যেতে মোটেই আমার মন চাইছিল না। এখন তোমার কী মত?”

বাবলু হেসে বলল, “কেউ নিজে থেকে এগিয়ে এলে তাকে আমাদের তরফ থেকে অলওয়েজ় ওয়েলকাম।”

বাচ্চু বলল, “তুমি থাকলে আমাদেরও ভাল লাগবে খুব। বিচ্ছু, কী বলিস?”

বিচ্ছু বলল, “আমিও এই ব্যাপারে এক মত।”

বিলু, ভোম্বলও বলল, “তোমার কারণেই তো এখানে আসা আমাদের।”

সুকন্যা বলল, "শুধু তোমার কারণে নয়, তানিশাও তো ছিল দলে।"

পঞ্চু অবশ্য এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব। ওদের কথাবার্তা কিছু বুঝলও না। তাই সাড়াশব্দও করল না।

এর পর ওরা ফ্রেশ হয়ে নিয়ে ম্যানেজারকে বলল তানিশার বাড়ির লোকেদের আসার কথা।

ম্যানেজার বললেন, "অতি উত্তম প্রস্তাব। তোমাদের আর কোনও দায়িত্বই রইল না।"

বাবলু বলল, "আমরা এখান থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। ওঁরা ওদের মেয়েকে নিয়ে চলে যান কলকাতায়। আপনি আমাদের একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। সেই গাড়ি ঘাটশিলায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসুক আপনার হোটেলেই। আমরা ইচ্ছেমতো ঘুরে দু'-এক দিন থেকে ট্রেনেই হাওড়া পৌঁছে যাব।"

ম্যানেজার বললেন, "যা তোমরা বলবে।"

কথায় কথায় চা-পর্ব শেষ হতেই তানিশার গাড়ি এসে গেল।

ওর বাবা-মা প্রথমে শুভলক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরলেন। তার পর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেককে অনেক আদর, অনেক আশীর্বাদও করলেন। কিছু ক্ষণ থেকে বিদায় নিলেন গভীর প্রশান্তি বুকে নিয়ে।

ওরা চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও যাওয়ার পালা।

ম্যানেজারের নির্দেশে বড় গাড়িই এল একটা। বড় গাড়ি ছাড়া হবেই বা কেন? এরা পাঁচ জন। পঞ্চুকে নিয়ে ছয়। এ দিকে সুকন্যা, শুভলক্ষ্মী ও জয়ন্তিকা। অতএব বড় একটা গাড়ি লাগবেই।

একটু পরেই জলযোগ পর্ব শেষ হওয়া মাত্র গাড়ি এল। সহৃদয় ম্যানেজার কী যে করবেন, যেন ভেবে পেলেন না। ওদের সবাইকে ভাল ভাবে গাড়িতে বসিয়ে বললেন, "আবার কখনও কোনও সময় এ দিকে আসতে ইচ্ছে হলে ফোনে জানিয়ে এসো। সত্যি, তোমরা আসায় খুব ভাল লেগেছে আমার। সবাই ভাল থেকো," বলে সকলের সঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো তুলে পঞ্চুকে নিয়ে খান চারেক ফটো তুলে ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বললেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলেও অনেক ক্ষণ ধরে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদন জানালেন সকলকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এর আগে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ট্রেনযোগে ঘাটশিলায় এলেও সড়ক পথে এই প্রথম। তখন ওরা সদ্য কিশোর। এখন কৈশোর-উত্তীর্ণ সাবালক, তাও দলে ওরা কয়েক জন। কী আনন্দ! কী আনন্দ সবার মনে।

ড্রাইভার জানতে চাইলেন, "ঘাটশিলায় তোমরা কোথায় থাকবে কিছু ঠিক করেছ?"

বাবলু বলল, "না। অনেক দিন আগে এক বার এসেছিলাম। তবে স্টেশনের কাছাকাছি একটা ধর্মশালায় ছিলাম, তা
মনে আছে।"

"তা হলে আমি তোমাদের আমার পরিচিত একটা গেস্ট হাউসে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, সেখানেই থাকবে তোমরা। দুটো ঘরের ব্যবস্থা করে দেব। একটায় তোমরা ছেলেরা থাকবে, আর একটায় মেয়েরা।"

বাবলু বলল, "আমরা সব সময় এই রকম ঘরই বেছে নিই। তাই আপনার পছন্দ মতো ঘরেই নিয়ে চলুন আমাদের।"

বিলু বলল, "একেই বলে কপাল। মেঘ না চাইতেই জল!"

বাবলু বলল, "এখন অবশ্য ঘাটশিলায় থাকার জায়গা প্রচুর হয়েছে। তবে চেনা-পরিচিতির মধ্যে হওয়ায় ভালই হল।"

গাড়ি এক সময় ঘাটশিলায় পৌঁছোল, তার উন্নত পরিবেশ দেখে চোখে যেন পাতা পড়ল না ওদের।

যে গেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি এসে থামল, তাদের সবাই ড্রাইভারের পরিচিত। ওরই পছন্দ করা দুটো ঘর খুলে দেওয়া হল ওদের জন্য। ভাড়ার ব্যাপারে চুক্তি হয়ে গেল। অ্যাডভান্স ও ডিপোজিট দিয়ে ঘরের দখল নিল ওরা।

সুকন্যা, শুভলক্ষ্মী, জয়ন্তিকা ও বাচ্চু-বিচ্ছু একটা ভাল ঘর বেছে নিল। বাবলুরাও তেমনই একটা ঘরে। অর্থাৎ দুয়ে মিলে দশ জন হয়ে গেল ওরা। পাঁচ-পাঁচ।

পঞ্চুর জন্য অন্য শয্যা লাগে না। ও তাই ঘরের আরাম-কেদারাটা বেছে নিল।

ওদের ড্রাইভার বিদায় নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখন মুক্ত বিহঙ্গ। তাই প্রথমেই ওরা গাড়ির জার্নি দূর করতে ওয়াশ রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। দোতলায় ঘর। তাই নীচে এসে চা আর টোস্টের অর্ডার দিল।

ভোম্বল বলল, "ঘাটশিলায় কী বিখ্যাত বলো তো?"

শুভলক্ষ্মী বলল, "কী করে জানব বলো? এর আগে কি এখানে কখনও এসেছি?"

ভোম্বল গলা ফাটিয়ে বলল, "রসমালাই।"

বিলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "সেটা আগে ছিল। এখন আর নেই। কিছু দিন হল আমার এক বন্ধু ঘাটশিলা থেকে ফিরে রসমালাই খাইয়েছিল, তা আমাদের পাড়াতেও তৈরি হয়।"

ওদের কথা শুনে হাসতে লাগল সবাই।

জয়ন্তিকা বলল, "এখন সব জায়গারই ওই একই অবস্থা। সে বার বর্ধমান থেকে আসার সময় এমন ল্যাংচা খেলাম, সেটা ছানার কী সুজির, তা বোঝা গেল না।"

ওদের খাওয়া শেষ হলে বাবলু বলল, "চলো, সবাই কাছাকাছি ফুলডুংরি পাহাড় থেকে ঘুরে আসি। ওই জায়গার স্মৃতি আজও ভুলিনি। একদম হাঁটা পথের রাস্তা।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "সুবর্ণরেখায় যাবে না?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, যাব। আগে ফুলডুংরিতে যাই। ওখানে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে তার পর যাব।"

অবশেষে সবাই ওরা ফুলডুংরি পাহাড়েই চলল। জঙ্গলের পথ অনেক হালকা হয়ে গেছে। তবুও সে তার সৌন্দর্য হারায়নি। এখনও সে বনময়। আগের সঙ্গে যদিও তার অনেক অমিল। তবুও সে বারের মতো প্রাণভীতি নেই। এক সময় ফুলডুংরি পৌঁছোল ওরা।

মেয়েরা যে যে-ভাবে পারল, ঘুরে বেড়াতে লাগল। পঞ্চুও কখনও ল্যাং-ল্যাং করে, কখনও নেচে-নেচে, কখনও ডিগবাজি খেয়ে ওর কায়দাকানুন দেখাতে লাগল। অর্থাৎ

শান্তির পরিবেশ একটা তৈরি হয়ে গেল কিছু ক্ষণের মধ্যে।

এক সময় বাবলু সবাইকে ডেকে বলল, “ঘন বনের পাশ দিয়ে ওই যে রাস্তাটা দূরের দিকে চলে গেছে দেখছ, ওই পথ দিয়েই আমরা এখানকার মুকুলবাবুর লরিতে ধারাগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলাম। আমাদের জীবনে সে এক অন্য স্মৃতি।”

এই ভাবে ওরা অনেকটা সময় কাটানোর পর এক সময় মৌ ভান্ডারে এল। সেখান সুবর্ণরেখার সেতু দেখে অভিভূত সকলে। সোনার নদী সুবর্ণরেখা। কী তার স্বচ্ছ রূপ! বাবলু সবাইকে বিশেষ করে সুকন্যা, শুভলক্ষ্মী ও জয়ন্তিকাকে একটু দূরের দিকে তফাতে এনে বলল, “ওই দেখছ জায়গাটা, ওরই নাম, রাতমোহনা। পূর্ণিমার রাতে ওর চেহারাটাই পাল্টে যায় এখানে।”

জয়ন্তিকা বলল, “নাম শুনেই যেন মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। তুমি কি এখন নিয়ে যাবে আমাদের?”

“নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তোমাদের না নিয়ে গেলে আমার মন ভরবে কেন? তা ছাড়া তোমরা যেতে না চাইলেও আমরা যাব। এ আমাদের প্রথম কৈশোরের স্মৃতি।”

অতএব সবাই দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলল রাতমোহনার দিকে। এখানেই বাঁ দিক ঘেঁষে একটি আদিবাসীদের বস্তি ছিল। তখন মনে হয় তাদের উচ্ছেদ হয়েছে এবং তারা সরে গেছে অন্য কোথাও। কেননা এখানে এখন মৌ-ভান্ডারের বিস্তৃতির কারণে অনেক কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে। তবু রাতমোহনার রূপও মলিন হয়নি।

এক সময় ওরা পৌঁছে গেল রাতমোহনায়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়া সবাই উল্লসিত হল এ বার। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও যে হল না, তা নয়। আর বাকিদের তো কথাই নেই।

সাগরের যেমন কূল-কিনারা নেই, এখানেও তেমনি দিগন্তের শেষ নেই। চার দিকে শুধু উপল খণ্ড ও সোনা-রূপা-তামা-অভ্রের রেণু মাখানো পাথরের সমারোহ। যত দূর চোখ যায় শুধু বালি ও পাথর। তবে কালো পাথর নয়। মার্বেল পাথরের মতো সাদা, লাল, ও সোনালি।

শুভলক্ষ্মী ও সুকন্যা আনন্দের বশে সেই পাথরকে জড়িয়ে ধরে মনের সাধ মেটাল। জয়ন্তিকাও বাদ গেল না। বলল, “পাণ্ডব দ্য গ্রেটের উৎসাহেই আজ আমরা ঘাটশিলায়

এলাম। না হলে এখানে আমরা নিজে থেকে কোনও দিনই আসতাম না। ফলে এই পৃথিবীর একটা চমৎকার পরিবেশ না দেখে বঞ্চিত হতাম। সত্যি, কী ভাল যে লাগছে, তা বলে বোঝাতে পারব না।"

সুকন্যা বলল, "রাতমোহনার রূপ দেখতে গেলে কি পূর্ণিমাতেই আসতে হবে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ ওই পক্ষে। তবে এখানটাও ফাঁকা হলে এর আশপাশের বনভূমির চেহারা দেখছ তো? রাতে কিন্তু জায়গাটা অত্যন্ত মারাত্মক।"

"তখন লোকে এখানে আসে কী করে?"

"বলতে পারো, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণ হাতে করে। তবে তারা সবাই আসে সশস্ত্র হয়ে এবং মশাল নিয়ে। তা ছাড়া বন্দুক-পিস্তলও থাকে সঙ্গে। একাদোকা কেউ আসে না। দলবদ্ধ হয়েই আসে।"

এর পর সবাই ওরা এক এক করে নেমে এল সুবর্ণরেখা নদীতে। সেখানে জলে পা ডুবিয়ে, কী আনন্দটাই না পেল! আর দেখল এক দল ছেলে-মেয়ে ও কিশোর-কিশোরী ছাঁকনি দিয়ে সুবর্ণরেখার স্রোতের মুখে ভেসে আসা বালি ছেঁকে তুলছে।

সুকন্যা বলল, "ও কী করছে ওরা?"

জয়ন্তিকা বলল, "মনে হয় মাছ ধরছে।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "না, না, অন্য কোনও ব্যাপার। কেননা দেখছ তো, বালিগুলো ওরা অন্য একটি মাটির পাত্রে, কেউ বা কাচের জায়গায় তুলে রাখছে।"

ওদের বক্তব্য শুনে এক জন স্থানীয় ভদ্রলোক বললেন, "ওই বালিগুলোর মধ্যে অজস্র স্বর্ণরেণু আছে। ওরা সেগুলো ওদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে বিশেষ কিছু উপায়ে আলাদা করবে। ওরা হল সোনাখোঁচা। নদীর ও পারে কোনও না-কোনও গ্রামে থাকে ওরা।"

বাবলু বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেছে। এ বার চলো গেস্ট হাউসে ফেরা যাক। সুবর্ণরেখায় স্নান করে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা যাক। বিকেলে নিয়ে যাব রঙ্কিনী মন্দির। খুব ভাল লাগবে জায়গাটা। মন ভরে যাবে।"

অতএব সবাই ওরা হাঁটা পথেই গেস্ট হাউসে ফিরে এল। তার পর কিছু ক্ষণের মধ্যে স্নানের জন্য তৈরি হয়ে বাজারের সামনে দিয়ে সুবর্ণরেখায় চলল স্নান করতে।

অনেক দিন আগেকার ব্যাপার হলেও নদীতে যাওয়ার রাস্তা ভুল হওয়ার নয়। কোনও স্নানার্থী স্নানে যাচ্ছেন। কেউ বা স্নান করে ফিরছেন। তাই পথ চিনতে অসুবিধে হল না। সুবর্ণরেখা এসে এখানকার বিস্তীর্ণ বেলাভূমি দেখে আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

পঞ্চু তো সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। তার পর এক এক করে সবাই। সুবর্ণরেখার স্রোতে গা ভাসিয়ে দারুণ আনন্দ পেল সকলে। স্নানের জায়গার কাছে জলস্রোতে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। তাই স্নান করতে অসুবিধে হল না কারও।

এখানেও সোনা-খোঁচারা দলে দলে বালি ছাঁকার কাজ করছে।

জয়ন্তিকার আগ্রহ দেখে এক জন সোনা-খোঁচা বলল, "তোমরা যদি দু'-চার দিন থাকো, তা হলে এক দিন আমাদের গ্রামেও নিয়ে যেতে পারি তোমাদের।"

শুনে তো আনন্দের অবধি রইল না ওদের। মেয়েরা সবাই এক জোট হয়ে বলল, "আমরা যাবই।"

ওরা বলল, "সব সময়ই জলপোকা হয়ে এখানেই থাকি আমরা। শুধু বন-ভালুকের ভয়ে রাত্রিটুকু ছাড়া।"

অতএব স্নান শেষে ডেরায় ফিরল সকলেই।

এখানকার ম্যানেজারও অত্যন্ত সদাশয়। খুবই যত্ন করে খাওয়ালেন সকলকে। কথাবার্তার ফাঁকে জানতে চাইলেন, "বিকেলে কী করবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "ভাবছি, ওদের রঙ্কিনী দেবীর মন্দিরটা দেখিয়ে আনব। তার পর এখানেই বাজারের কাছে থানার সামনে আর-একটা যে রঙ্কিনী মন্দির আছে, সেখানে এসে বেড়াব চার দিক।"

"সেই ভাল। তবে কাল সকালে বরং ধারাগিরিতে চলে যেয়ো তোমরা। এখন রাস্তা অনেক ভাল হয়ে গেছে। জঙ্গল আছে যদিও, তবু ভয় নেই। একটা বড় ট্রেকার হলেই কাজ হয়ে যাবে তোমাদের। খুব সকাল সকাল বেরোলে, দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে তোমরা।"

বাবলু বলল, "এটাই তা হলে ফাইনাল। কাল সকালে জলযোগ-পর্ব শেষ করেই বেরিয়ে পড়তে পারলে, কালই ধারাগিরি দর্শন।"

বিকেল হতেই ওরা বেরিয়ে পড়ল রঙ্কিনী দর্শনে। থানার কাছেই মায়ের যে মন্দির, প্রথমে ওরা সেই মন্দিরে গেল। এই দেবী অতি ভয়ঙ্করী। তবে এখানে শান্ত, সৌম্য মূর্তি তাঁর। এই অঞ্চলের সবাই মান্য করে এই দেবীকে।

বাবলু বলল, "এই দেবী আগে থাকতেন গালুডির অরণ্যে। ওই অরণ্যে গালুডি থেকে সাতগুলুম নদী পেরিয়ে এক পাহাড়ের উপর দেবীর অধিষ্ঠান ছিল। পরে অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দেবীকে নীচের গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।"

সুকন্যা বলল, "সেটা এখান থেকে কত দূর?"

"যত দূরেই হোক, এখনই যাব আমরা সেখানে," বলেই একটা বড় গাড়ি বুক করে সবাই চলল সেই রঙ্কিনী দেবীকে দর্শন করতে।

পাহাড়-জঙ্গলের দেশে, সড়ক পথে রাস্তার গায়েই মায়ের মন্দির ও জঙ্গলের পরিবেশ দেখে মন ভরে গেল সকলের।

এর পর দর্শন-শেষে আবার ফিরে এল এখানকার রঙ্কিনী মন্দিরে।

বাজারের একটা দোকানে বসে চা ও কেক খেল সবাই। তার পর চলে গেল হরিণ ধুয়াড়ি (ধুকুরি) হয়ে তামুক পালের বনে। বনের সেই শোভা-সৌন্দর্য এখন আর নেই। তবু যতটুকু যা আছে, তা কিন্তু নয়নাভিরাম।

এর পর আবার থানার সামনে এসে বাজারের আনাচকানাচে ঘোরাফেরা করল। তার পর সন্ধেয় মা রঙ্কিনীর মন্দিরে আরতি দর্শন করে ফিরে এল গেস্ট হাউসে। আনন্দে মন ভরিয়ে সারাটা দিন যে কী করে কাটাল, তা ওরাই জানে।

রাতে কষা মাংস ও রুটির অর্ডার দিল ওরা। সেই সঙ্গে ঘাটশিলার বিখ্যাত রসমালাই। প্রাণ ভরে তৃপ্তি করে খেল সবাই। সারাটা দিন যে কী ভাবে কেটে গেল ওদের, তা যেন স্বপ্নময় বলে মনে হল।

যাই হোক, রাতের খাবার শেষ হলেও অনেক রাত পর্যন্ত ওই সব আলোচনা নিয়েই সময় কাটাল ওরা। তার পর মেয়েরা মেয়েদের ঘরে গেল, বাবলুরা পঞ্চুকে নিয়ে ওদের ঘরে ঢুকল।

এমন সময় ম্যানেজার এসে বললেন, "কাল তোমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা তা হলে ফাইনাল?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই," তার পর বলল, "তবে এখনকার রাস্তা এখন কেমন, তা তো জানি না। তাই বলি, চ্যাংজোড়া হয়েই যেন যায়। ওখানে আমরা কিছুটা সময় কাটিয়ে তার পরে ধারাগিরি যাব।"

"যা তোমাদের ইচ্ছে। তবে কিনা চ্যাংজোড়া হয়েই যেতে হবে তোমাদের। তাই মন চাইলে নামবে। তবে ওখানকার জঙ্গল এখনও ভয়াবহ। ভালুকের উপদ্রব খুব বেশি ওখানে।"

বিলু বলল, "সে আমরা পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা করে নেব। আমাদেরও তো প্রাণের ভয় আছে।"

"তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। তোমাদের ব্যাপারে কোনও কিছু বলার নেই আমার। তবু সতর্ক করে দিলাম।"

ম্যানেজার চলে গেলে বাবলু বলল, "আর কেন? এ বার তা হলে শয়নে পদ্মলাভ করা যাক?"

সবাই বলল, "ঠিক। এ বার শরীরের ক্লান্তি একটু দূর করা একান্তই দরকার।"

এর পর সবাই যে-যার জায়গায় পজ়িশন নিয়ে শয্যাগ্রহণ করল। বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চুবাবু, তুমি ফিট আছ তো?"

পঞ্চু তত ক্ষণে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। বাবলুর কথা শুনে সাড়া দিল এ বার, 'গোঁ-ও —ও।'

পর দিন সকাল হতেই ওরা দূরের ধারাগিরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। সুকন্যা, শুভলক্ষ্মী ও জয়ন্তিকার মনে আনন্দ আর ধরে না। এত দিন ওরা ধারাগিরির নামই শুনেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে ওই জায়গায় যাওয়ার সুযোগ যে সত্যিই কখনও হবে, তা ভাবতেও পারেনি কেউ।

যাই হোক, ওদের জলযোগ পর্ব শেষ হতেই গাড়ির হর্ন শোনা গেল। ম্যানেজারের লোকেরা বলল, "এসে গেছে। এ বার তৈরি হও তোমরা।"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই তৈরি।"

অতএব আর বিলম্ব না-করে সবাই এসে গাড়িতে বসল।

ভোম্বল আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল, "জয় মা রঙ্কিনী!"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "বিলুদা, ধ্বনি দিলে না তো?"

বিলু বলল, "আমি এখন তো ধ্বনি দেব না। ঘুরে আসার পর জয়োল্লাস করে তবেই ধ্বনি দেব।"

বাবলু বলল, "তা-ই হোক তবে।"

গাড়ি হর্ন দিয়ে স্টার্ট দিল। শহুরে রাস্তা ছেড়ে গাড়ি ঢুকল গভীর জঙ্গলে। ঘন শাল গাছে ভরা এই জঙ্গলে প্রবেশ করে মন অন্য রকম হয়ে গেল। বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বনভূমি। হরীতকী আর কেন্দু গাছের বনভূমি। যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই সুমনোহর। এরই মধ্যে বনফুলের ঝোপও রয়েছে অনেক। অনেক বড় গাছে মাচা বাঁধা। বুনো হাতির দল খেতে ফসল নষ্ট করতে এলে ওই মাচায় বসে টিন বাজিয়ে ভয় দেখায় স্থানীয়রা।

এই ভাবেই এক সময়ে বুরুডি পাস হয়ে চ্যাংজোড়ায় এল ওরা।

ড্রাইভার জানতে চাইলেন, "গাড়ি কি থামাব?"

বাবলু বলল, "শুনেছি এখানে লেক আছে। সেখানে আর যাচ্ছি না। বরং চলো, সবাই চ্যাংজোড়াতেই যাই।"

অতএব গাড়ি এগিয়ে চলল।

এক সময় চ্যাংজোড়ার মুখে এসে থামল গাড়ি।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল বিপর্যয়। দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একটা গো-বাঘা ঝাঁপিয়ে পড়ল কোনও গৃহস্থের পোষা একটি ছাগলের উপর। পর ক্ষণে কেউ কোনও বাধা দেওয়ার আগেই সেটাকে মুখে নিয়ে উধাও হয়ে গেল গো-বাঘাটা।

কুকুরের ব্যাঘ্রভীতি সর্বজনবিদিত, কিন্তু পঞ্চুর কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? ওই দৃশ্য দেখে ও আর থাকতে না-পেরে 'ভৌ-ভৌ' ডাক ছেড়ে তির বেগে ধাওয়া করল ওই শিকারি গো-বাঘাটাকে।

তত ক্ষণে গ্রামের লোক ছুটে এসেছে অনেকে, বাঘটাকে লাঠিপেটা করে মারার জন্য। অবশেষে অনেক হুটোপাটির পর ঘায়েল হল বাঘটা। মৃত ছাগলটাকে মুখে করে অতি

কষ্টে টানতে টানতে সবার সামনে নিয়ে এল পঞ্চু। একটি দেশি কুকুরের এমন সাহস দেখে চমকে উঠল সবাই।

গ্রামবাসীরা সবাই পঞ্চুকে আদর করে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কৃতিত্ব যদিও পঞ্চুর নয়। তবে ওর বিক্রম অনেকটা কাজে দিয়েছে।

চ্যাংজোড়ার বাসিন্দারা ওদের সবার সঙ্গে পরিচয়-পর্ব সেরে ওখানেই যে-যার ঘর থেকে মুড়ি-তেলেভাজা আনিয়ে আপ্যায়ন করল ওদের। তার সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাও হল।

তার পর কয়েক জন নিয়ে চলল ওখানকার বনভূমির রূপ দেখাতে। অর্থাৎ এই একটি ঘটনায় সকলেরই মন জয় করে নিল ওরা।

এর পর ওরা জানতে চাইল, “ধারাগিরি যাওয়ার জন্য এসে হঠাৎ করে চ্যাংজোড়ায় নেমে পড়ল কেন ওরা?”

বাবলু বলল, “নামলাম বলেই তো, এত জনের সঙ্গে পরিচয় হল আমাদের! পঞ্চু কত আদর পেল। এ বার আমরা ধারাগিরিতেই যাব।”

দলের কয়েক জন ছেলে-মেয়ে দারুণ উৎসাহ দিল ওদের। বলাই নামে এক জন বলল, “ঠিক আছে। তোমরা ওখানে যাও। ঘুরে বেড়াও। একটু পরে হয়তো আমরাও চলে যাব তোমাদের কাছে। দারুণ ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।”

অতএব বাবলুরা ড্রাইভারকে বলল গাড়িতে স্টার্ট দিতে।

গাড়ি আবার ছুটে চলল ধারাগিরির পথে।

চ্যাংজোড়া থেকে ধারাগিরি খুব একটা বেশি দূরের পথ না। তাই কিছু ক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল সেই স্থানীয় সৌন্দর্যের দেশে।

ড্রাইভার এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, “এ বার এখান থেকে একটু হেঁটে যেতে হবে। কেননা, এত বড় বড় গাড়ি নিয়ে আর স্পটে যাওয়া যাবে না।”

অতএব নেমে পড়ল সবাই।

ওখানকার স্থানীয় ছেলে-মেয়েও কয়েক জন এসে জুটে গেল। তারাই এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ধারাগিরির সেই ঝর্নার ধারে।

আনন্দে এবং উত্তেজনায় কী যে করবে ওরা, কিছু ভেবে পেল না। সেই কবে এসেছিল, তার পরে এই। সেই সব পরিচিত মুখ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। প্রবীণরা দেহলীন হয়েছে অনেকেই। তরুণদের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। কেউ কেউ কর্মক্ষেত্রে মিশে গেছে অন্যত্র কোথাও। ওরাও তো বড় হয়ে গেছে অনেক।

ওরা যখন ঝর্নার জলে হুটোপাটি করছে, তখনই চ্যাংজোড়ার দল বারোটা মুরগি আর সেই বাঘে-ধরা মৃত ছাগলটাকে নিয়ে হাজির হল সেখানে।

বলাই যার নাম, সে বলল, "জোর পিকনিক করব আজ আমরা এখানে। তোমরা পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে তবেই এখান থেকে যাবে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "দারুণ মজা হবে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে একটা কথা, ওই বাঘের শিকার, ছাগলের মাংস আমরা কিন্তু কেউ মুখে দেব না।"

বলাইয়ের সঙ্গী হৃদে বলল, "কেন? এ তো টাটকা সবেমাত্র..."

ভোম্বল বলল, "এর পর ওই ছাগল যদি পেটে গিয়ে ভূত
হয়ে শিং ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, তখন কিন্তু দারুণ একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে।"
ভোম্বলের কথা শুনে হাসল সবাই।

অতএব ওরা এখান থেকেই কিছু সরঞ্জাম জোগাড় করে রান্নার আয়োজন করল। এক দিকে বসল মুরগির মাংস, অপর দিকে ছাগলের। বড় দুটো হাঁড়িতে বসল মোটা চালের ভাত।

মাংস রান্নার গন্ধে চার দিক যেন ম ম করতে লাগল।

ধারাগিরিতে বেড়াতে এসে এমন অভিজ্ঞতা যে হবে, তা ভাবতেও পারেনি কেউ। সত্যি, ভাগ্যে থাকলে কী না হয়!

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জীবনে এ-ও এক অন্য অভিজ্ঞতা।

বিলু, ভোম্বল তো ঝর্নার গা বেয়ে একেবারে মাথায় উঠে নাচতে লাগল। বার বার ডাকতে লাগল বাবলুকে ওখান উঠে আসার জন্য, কিন্তু বাবলু গেল না।

মেয়েরা সবাই দু'-এক বার চেষ্টা করে পালিয়ে এল। তবে ঝর্নাকে ঘিরে ওরা যে আনন্দের প্রকাশ ঘটাল, তা মনে রাখার মতো।

মেয়েরা কেউই স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে আসেনি বলে স্নানের আশা ত্যাগ করল। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই দেখিয়ে দিল, স্নান কাকে বলে!

যাই হোক, রান্নার কাজ শেষ হতেই দুপুর দুটো বেজে গেল।

এর পর শুরু হল মাংস-ভাতের তৃপ্তির খাওয়া। ওদের গাড়ির ড্রাইভারকেও ডেকে আনা হল। মনের আনন্দে উনি দু'রকম মাংসই খেলেন।

"আমার খাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাছ-বিচার নেই," বলেই তিনি বললেন, "খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম সব কিছু। এ বার তা হলে রওনা দেওয়া যাক?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, এ বার ঘাটশিলাতেই। কেননা দলে দলে ভালুক যদি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরে, তখন গাড়িও নিরাপদ হবে না আমাদের কাছে।"

তাই সবাই ওরা সকলের সঙ্গে বিদায় নিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। তবে বাবলু হঠাৎই গাড়ি থেকে নেমে এসে এখানকার ছেলে-মেয়েদের হাতে বেশ কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই দিয়ে তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো। ভাল থেকো সবাই, কেমন?"

টাকা পেয়ে কী আনন্দ সকলের! সবাই বলতে লাগল, "আবার তোমরা কবে আসবে, বন্ধুরা?"

বাবলু বলল, "ভালবেসে তোমরা ডাক দিলেই আমরা আসব।"

আর দেরি নয়। গাড়ি এ বার দ্রুত গতিতে চলল। বলাই, হৃদে এবং ওদের সবাইকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে চ্যাংজোড়া হয়ে বুরুডির গা ঘেঁষে নেমে এল ঘাটশিলায়।

গেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই বিলু জয়ধ্বনি করল, "জয় মাতা রঙ্কিনীর জয়!"

সবাই এক সুরে বলে উঠল, "জয় মা! জয় মা! জয় মা!"

পঞ্চুও জয় দিল ওর সুরে, 'ভৌ-ভৌ-ভৌ।'

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ম্যানেজার বললেন, "কেমন লাগল ধারাগিরি?"

সবাই বলল, "দারুণ।"

এর পর যে-যার ঘরে গিয়ে নির্দিষ্ট শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। সবারই মন ভরে গেছে ধারাগিরিতে গিয়ে। সত্যি, কী সুন্দর!

সে রাতে শুধু বেশি করে রসমালাই খেয়েই নিদ্রা গেল ওরা। অন্য খাবার কিছু খেল না।

শুয়ে শুয়েই ওরা নানা রকম চিন্তা করতে লাগল। বাবলু বলল, "আর কেন? কাল বিকেলেই ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করা যাক। অযথা এখানে থেকে আর লাভ কী! তানিশা ফিরে গেলেও জয়ন্তিকার বাড়ির লোকেরাও তো খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে।"

ভোম্বল বলল, "সে-ই ভাল। পরে নতুন করে কোনও উৎসাহ নিয়ে বরং আবার আসা যাবে। অতএব মেয়েদের জানিয়ে দেওয়া হোক এই আলোচনার ব্যাপারটা। তা হলে ওরা

চটপট তৈরি হয়ে নিতে পারবে। কাল সকালেই কেটে পড়ি চলো।"

বিলু বলল, "সঠিক সিদ্ধান্ত! কালই তা হলে প্রত্যাবর্তন।"

ওদের কথার মাঝেই দরজায় শব্দ হল টক টক টক। বিচ্ছু গিয়ে দরজা খুলতেই মেয়েরা এক এক করে সবাই ঢুকে এল ঘরের ভিতর।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী? কাল সকালে আমাদের বাড়ি ফেরার ব্যাপারেই আলোচনা হচ্ছিল। যাক, এখানেই আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক।"

বাবলুর কথামতো তা-ই হল।

শুভলক্ষ্মী আর জয়ন্তিকা সমস্বরে বলল, "ফেরার ব্যাপার মানে? কালই চলে গেলে কী করে হবে? এখানকার গেস্ট হাউসের ছেলেরা বলছিল আমরা যেন মুসাবনিতে গিয়ে জিলিংডুংরি পাহাড় অবশ্যই উঠি। দারুণ সুন্দর জায়গা। এখানে ওদের পরিচিত শেরু নামের এক জন আছে। সে তোমাদের ওই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করবে। তাই ভাবছি কাল সকালে আমরা জিলিংডুংরি দেখে দুপুরে যাব সোনা-খোঁচাদের গ্রামে। না হলে তো মন ভরবে না কারও!"

বাবলু সবার দিকে তাকাতে যাচ্ছে, বিচ্ছু চোখের চাহনিতে সায় দিল যাওয়ার ব্যাপারে।

ভোম্বল বলল, "যাদের তাগিদে আসা, তাদেরই যখন ফেরার গা নেই তখন আমাদেরই

বা আপত্তি কিসের?”

অতএব এই সিদ্ধান্তই পাকা হল। কাল এখানে থেকে রাত্রিবাস করে পরশু সকালের ট্রেনে যাওয়া। এর আর নড়চড় হবে না। এটাই ফাইনাল।

অতএব পর দিন সকালে ওরা মুসাবনি হয়ে জিলিংডুংরিতে যাওয়ারই প্রস্তুতি নিল। কেননা সবারই মনে হতে লাগল, এখানকার উপদ্রবহীন পাহাড় ও প্রকৃতি যেন সব সময় ওদের দু'হাত ধরে টানছে।

শুধু এক কাপ করে চা ও টোস্ট খেয়ে সবাই রওনা হল জিলিংডুংরির দিকে।

যথাস্থানে পৌঁছে ওরা গাড়ি ছেড়ে দিল। কারণ সারা দিনই এ পথে ছোট গাড়ি, জিপ ও ট্রেকারের চলাচল আছে। দূরত্বও এমন কিছু নয়। তাই অযথা একটা বড় গাড়ি আটকে রাখা ঠিক নয়।

যাই হোক, ওরা বাজারের চার দিকে ঘুরে নাম ধরে সবার কাছে খোঁজ নিয়ে, এক সময় আবিষ্কার করল শেরুকে। তার পর ওর সঙ্গ নিয়েই উঠতে লাগল পাহাড়ে।

শেরু বলল, “এই পাহাড়কে অনেকে বলে ধাবুনি। কিন্তু আমাদের ভাষায় আমরা বলি জিলিংডুংরি।”

ঘন জঙ্গলে ভরা মাঝারি সাইজের পাহাড়ে হাত ধরাধরি করে উঠল সবাই। শেরু ওদের সবাইকে উঠতে সাহায্য করল। তার পর পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠেই চমক।

মাথাটা একেবারেই সমতল। তবে জঙ্গল আছে সেখানেও। ফাঁকা জায়গাও অনেক। তাই মনের আনন্দে চার দিক ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা।

বহু দূরের দৃশ্য আর পাহাড়ের পর পাহাড় চোখে পড়ল ওদের। সোনার নদী সুবর্ণরেখার দৃশ্যও দেখা গেল ভাল ভাবে।

জয়ন্তিকা বলল, “এই সব দেখার জন্যই লোকে ঘাটশিলা বেড়াতে আসে। কী নেই এখানে? পাহাড়-নদী-বন-জঙ্গল-মন্দির সবই তো আছে। আমি এ বার থেকে সময় পেলেই এখানে চলে আসব। আজ বিকেলে সোনা-খোঁচাদের গ্রামটা ঘুরে আসি। তার পর নতুন উদ্যমে আসা-যাওয়া করব বার বার।”

শুভলক্ষ্মী বলল, “হ্যাঁ। বছরে দু'বার বিভিন্ন ঋতুতে এখানে এলে মন্দ কী? মন-প্রাণ

সত্যিই ভরে যাবে।"

যাই হোক, এই ভাবে ওরা অনেকটা সময় কাটানোর পর সবাই এক এক করে নেমে এল নীচে। তার পর একটা দোকানে বসে বেশি করে শিঙাড়া, কচুরি ও জিলিপি খেয়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বকশিশ হিসেবে ওর হাতে দিতেই, আনন্দে-লজ্জায় যেন সিঁটিয়ে মিশে গেল শেরু।

এর পর ওদের পছন্দ মতো বেশ কিছু জিনিস কেনাকাটা করল ওরা। তার পর একটা বড় দেখে ট্রেকার ভাড়া নিয়ে সোজা চলে এল ঘাটশিলায়। এর পর গেস্ট হাউসে এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যেই হইচই করল বিন্দাস। তার পর ঘরেই স্বপ্নের আশ মিটিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে প্রস্তুতি নিল সোনা-খোঁচাদের গ্রামে যাওয়ার জন্য।

গেস্ট হাউসের ছেলেরা বলল, "বড্ড দেরি করে ফেললে তোমরা। এটা সকালের দিকেই যেতে পারতে। যদিও ভয় নেই কিছু। তবু অচেনা জায়গা তোমাদের। তার উপর বাঘ-ভালুকের দেশ। অতএব সাবধান। বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।"

সবার সতর্কবাণী কানে নিয়ে ওরা সুবর্ণরেখা যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

এক এক করে নীচে নেমে প্রথমেই গেল রঙ্কিনী মন্দিরে। মন্দির তখনও খোলা। তাই দর্শন সেরে চেনা পথ ধরেই চলে এল নদীতে।

বাবলু দূর থেকেই হাঁক দিল এক জন সোনা-খোঁচাকে, "কানাইয়া রে-এ-এ-এ..."

সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে আগের দিনের পরিচিত একটি ছেলে ওর নৌকা নিয়ে এ পারে এল। এসে এক এক করে পার করে দিল ওদের সবাইকে। ওর সঙ্গে সহযোগিতাও করল দু'-এক জন।

ওরা একে একে পৌঁছে গেল নদীর ও পারে। ও দিক থেকে এ পারের দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেল। নয়ন-মন আবারও ভরে গেল যেন!

সোনা-খোঁচাদের ওখানে গিয়ে কী যে করবে, ওরা কিছু ঠিক করতে পারল না। ওদের গ্রামের আর-সব মেয়ের কাছে জানতে চাইল, কী ভাবে ওরা বালি থেকে সোনা ছেঁকে আলাদা করে তা দেখাতে।

সোনা-খোঁচারা ওদের নিয়ে গেল সেই জায়গায়।

ওরা দেখল সবই, তবে বিশেষ কিছু বুঝল না। তবু আনন্দ। তার চেয়েও বড় যেটা, সেটা হল গ্রামবাসীদের ধৈর্য। সবাই যে এ কাজ করছে, তা কিন্তু নয়। গৃহকর্ম বা অন্য কর্মও করছে তারা।

এই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। কাছে-দূরে কত পাহাড়। ছোট-বড় অনেক পাহাড়ের অবস্থান সেখানে। এর মধ্যে কোনওটি বর্ণময়, কোনওটি সবুজে-ঘেরা।

জয়ন্তিকা বলল, "ওই পাহাড়গুলোর কাছে কি যাওয়া যেতে পারে? আমার মন খুব বলছে ও দিকে যাওয়ার জন্য।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "এই তো বেশ আছি, দূর থেকে দেখছি। ভালই লাগছে। তাই কী দরকার, ও দিকে গিয়ে বিপদ বাড়ানোর?"

"আসলে এই পাহাড়গুলোর সৌন্দর্য দেখে, আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। চল না রে, কেউ আমার সঙ্গে।"

অগত্যা মেয়েরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের আরও কাছে এগিয়ে গেল। ওদের যেতে দেখে বাবলু পঞ্চুকেও সঙ্গে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল।

পঞ্চু তো সব সময় এটাই চায়। তাই একটুও দ্বিধা না-করে সঙ্গ নিল ওদের।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিন জনেই তখন সোনা-খোঁচাদের ছাঁকনির ব্যবহার দেখতে লাগল। এ জিনিস তো মিত্তিরদের বাগানে দেখা যাবে না।

অনেক পরে মেয়েরা যখন সামনের পাহাড়টার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখনই বাচ্চু-বিচ্ছুর চিৎকার শোনা গেল।

বাবলু সজাগ হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী! ওরা হঠাৎ ওই ভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেন? নিশ্চয়ই ওদের কোনও বিপদ হয়েছে। চল তো দেখি!" বলেই দ্রুত ওই পাহাড়ের দিকে গেল।
ওরা যেতেই বাচ্চু বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, বাবলুদা! আমরা এখানে এসে প্রকৃতির রূপ দেখছি, হঠাৎ জঙ্গল থেকে এক দল হরিণকে আসতে দেখে জয়ন্তিকা ওদের আদর করতে গেল। তখনই হরিণগুলো উধাও হয়ে গেল ভয় পেয়ে!"

"তার পর?"

“হরিণগুলোর সঙ্গে জয়ন্তিকাও উধাও।”

“তার মানে? এত কাণ্ডের পর আবারও নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনল ও।”

বিলু বলল, “শুভলক্ষ্মী, তুমি কি দেখেছ ও কোন দিকে গেছে?”

বিচ্ছু বলল, “না। কেউ দেখিনি। আমরা হরিণগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেই, ওরা এমন লাফালাফি শুরু করল যে, ভয় পেয়ে আমরা পিছু হটলাম।”

বাবলু বলল, “সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু কই? পঞ্চুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?”

বাচ্চু, বিচ্ছু, বিলু, ভোম্বল বাবলুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই এক জোটে ডাকতে লাগল পঞ্চুকে।

কিন্তু না। কোনও দিক থেকেই পঞ্চুর কোনও সাড়া-শব্দ ভেসে এল না।

বিস্মিত বাবলু বলল, “এমন তো কখনও হয়নি। পঞ্চুর ভৌ-ভৌ শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যায়। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে ওরা। খুব খারাপ কিছু-একটা হয়েছে।”
শুভলক্ষ্মী বলল, “ওদের দু'জনকেই বাঘে ধরেনি তো?”

বাবলু চিৎকার করে উঠল এ বার, “না, না। এ হতে পারে না। এ কথা মুখেও এনো না কেউ,” তার পর কিছু ক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের এ দিক সে দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, “জঙ্গল খুব ঘন। তাই বিপদের আশঙ্কা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যদিও আশঙ্কাটা এখন প্রকট, তাই এই অবস্থায় ওরা ফিরে আসবে এমনটা আশা করা যায় না। অতএব ওদের সন্ধানে যেতেই হবে আমাদের।”

বিলু বলল, "আর দেরি নয় বাবলু, তুই মেয়েদের নিয়ে এগিয়ে যা। ভোম্বলকে নিয়ে আমি সোনা-খোঁচাদের গ্রাম থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "না। মেয়েরা কেউ যাবে না। ওরা নীচে থেকে চার দিকে নজর রাখুক, পাহারা দিক।"

শুভলক্ষ্মী বলল, "আমার হাতে পিস্তল আছে। আমি তোমার সঙ্গে যাই। না হলে একা তুমি..."

বাবলু বলল, "কে বলল, আমি একা? বিলু, ভোম্বল এখনই এসে পড়বে।"

কথা বলতে বলতেই বাবলু "পঞ্চু, পঞ্চু," করে হাঁক দিয়ে পাহাড়ের উপর ওঠার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও কিন্তু পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। জয়ন্তিকার তো নয়ই।

বেশি ক্ষণ দাঁড়াতে হল না। দূরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল বিলু, ভোম্বল দু'জনে দুটো কুড়ুল হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

ওরা কাছে এসে বলল, "পঞ্চুর কোনও হাঁকডাক শুনতে পেলি?"

বাবলু বলল, "না।"

"তা হলে চল, যত দূর পারি আন্দাজে ভর করে এগিয়ে যাই।"

অতএব মেয়েদের নীচে রেখেই পর্বতারোহণ শুরু করল ওরা। কিন্তু ওরা যে কোন দিক দিয়ে কোথায় গেছে, তা অনুমান করতে পারল না কেউ। তবুও আন্দাজে ভর করেই এগিয়ে চলল ওরা। একটু উচ্চ ভূমিতে ওঠার পর হঠাৎই এক জায়গায় এক দল হরিণকে নির্ভয়ে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। আর সেখানেই দেখল মুখ-বাঁধা পঞ্চুকে কেউ বা কারা যেন একটা বড় গাছের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

বাবলুদের দেখে হরিণগুলো থমকে দাঁড়াল। ভয় পেয়ে পালাল না। বিলু, ভোম্বল তত ক্ষণে পঞ্চুর বাঁধন খুলে দিয়েছে।

.

(অসমাপ্ত)
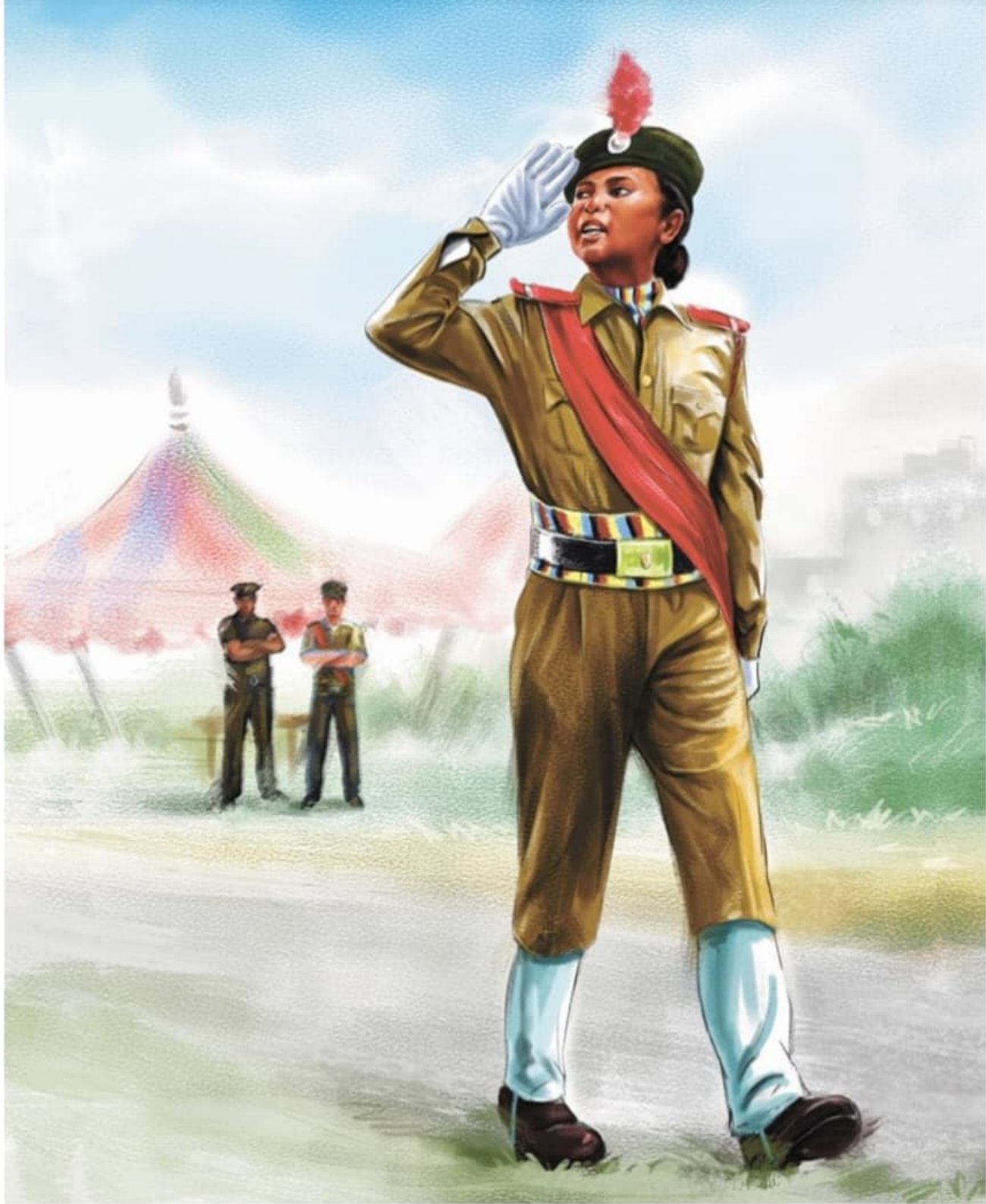
ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

জয়ী

সুমন মহান্তি

বিল্ডিংটার সামনে বড় সবুজ মাঠ। সেখানে খাকি ইউনিফর্ম পরে কিছু ছেলে-মেয়ে ড্রিল করে চলেছে। একতা গুরুং এই স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েছে দশ দিন আগে। কো-এড স্কুল, ইংরেজি এবং বাংলা মাধ্যম দুটোই আছে। আপাতত সে এই স্কুলের নাইন 'এ' সেকশনের ছাত্রী। জন্ম সূত্রে গোর্খা হলেও বাংলাটা মাতৃভাষার মতোই বলতে পারে। একতা নেহাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরা ড্রিল করছে কেন? ওরা কারা?"

নেহা উত্তর দিল, "ওরা এনসিসি করে। এই স্কুলেরই স্টুডেন্ট।"

একতা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। এনসিসি কী, তা সে জানেই না। তার পর থেকেই ক্লাস চলা সত্ত্বেও বার বার মাঠের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে তার। ছেলে-মেয়েদের একই তালে ও ছন্দে ড্রিল করার দৃশ্যটা খুব মনে ধরেছে তার। তবে কৌতূহল রয়েই গেল মনের মধ্যে। উত্তর না-পাওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। পরের পিরিয়ডে তমাল স্যারকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, "পুরো নাম হল ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর। একেই সংক্ষেপে বলা হয় এনসিসি। এ নিয়ে বিশদে জানতে চাইলে তুমি বসন্ত স্যারের সঙ্গে দেখা করো। তিনি ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেবেন। আজ স্যর আসেননি। আগামী কাল এলে, দেখা করে নিয়ো।"

"স্যর যদি বকেন!"

"কেন বকবেন? আচ্ছা, তুমি টিফিন-ব্রেকের সময় যেয়ো। আমি কথা বলিয়ে দেব।"

পরের দিন বসন্ত স্যারের সঙ্গে দেখা করল একতা। মনে তার এক গাদা প্রশ্ন। ধৈর্য নিয়ে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি। টিফিন পিরিয়ডের পরে ছেলে-মেয়েরা ড্রিল করে চলেছে। বসন্ত স্যর জানিয়েছেন যে, আর ক'দিন পরেই প্রজাতন্ত্র দিবস। সেই উপলক্ষে স্কুলে প্যারেড করবে এনসিসি-র ছেলে-মেয়েরা। তারই মহড়া চলছে। সতৃষ্ণ চোখে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল একতা। বসন্ত স্যর বলেছেন যে, পরের মাসের প্রথম সপ্তাহে এনসিসি-র জন্য অ্যাপ্লিকেশন নেওয়া হবে। তার আগে সমস্ত ক্লাসে নোটিস যাবে। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরে এক দিন ইন্টারভিউ হবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ফর্ম ফিল-আপ করে, তাদের প্রায় সবাইকেই এই পদ্ধতিতে নিয়ে নেওয়া হয়। কাউকে ফেরানো হয় না।

একতার বাবা ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের এক জন জওয়ান। একতার আগ্রহ দেখে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, "শাবাশ বেটি! তুই যে নিজে থেকে আগ্রহ দেখাচ্ছিস, এতে আমি খুব খুশি।"

অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল-আপ করে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে একতা। নোটিস আসে ক্লাসে। এগারোই ফেব্রুয়ারি এনসিসি-র ইন্টারভিউ হবে।

আগের রাতে উত্তেজনায় ঘুম এল না একতার। তাদের ক্লাসের তিথি দু'বছর হল এনসিসি করছে। তিথি অবশ্য বলেছে, "ইন্টারভিউ নিয়ে আবার টেনশন! কী যে বলিস! মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ জন অ্যাপ্লাই করে। ফিজিকালি অ্যাপিয়ার হলেই নিয়ে নেওয়া হয়।"

বাইরে থেকে এক জন এনসিসি অফিসার এসেছেন। স্কুলের মাঠে অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি চেয়ারে তিনি বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে রয়েছেন বসন্ত স্যর, স্কুলের এনসিসি ইন চার্জ। মূলত শারীরিক মাপজোককেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

দু'-একটা মামুলি প্রশ্নের পরে তার উচ্চতা মাপা হল। একতা খুব খুশি, তার স্বপ্ন এ বার সফল হতে চলেছে। সকলের ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ হতেই এনসিসি অফিসার গাড়িতে চেপে চলে গেলেন। বসন্ত স্যর তাকে ডাকলেন।

"তোমাকে নেওয়া যাচ্ছে না একতা।"

একতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, "কেন স্যর?"

"তোমার হাইট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্তত পাঁচ ফুট হাইট হতেই হবে। এটাই রুল। অফিসার সই-সাবুদ সেরে চলে গেলেন। তুমি বাদ পড়েছ।"

একতা কোনও কথা না-বলে চুপচাপ ব্যাগ কাঁধে নিয়ে গেটের বাইরে বেরোল। ইএফআর থেকে এই স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটে বসে প্রাণপণে কান্না চাপল একতা। কিছুই ভাল লাগছে না তার। একটা স্বপ্ন আজ যেন ভেঙেচুরে গেল। কত কিছু ভেবে নিয়েছিল সে! খাকি ইউনিফর্ম আর টুপি পরে মাঠে ড্রিল করবে, সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে, এত ভাল করবে যে সকলে পিঠ চাপড়ে দেবে। এ সব কিছুই হবে না?

সারা রাত জেগে রইল একতা। কিছুতেই দু'চোখের পাতা সে এক করতে পারছে না।

যথা সময়ে স্কুলে পৌঁছোল একতা। না, সে এত সহজে হার মেনে নেবে না। ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হতেই সে টিচার্স রুমের দিকে ছুটল।

"মে আই কাম ইন স্যর?"

বসন্ত স্যর বললেন, “এসো।”

“কোনও ভাবেই এনসিসি জয়েন করতে পারব না স্যর?”
“কালকেই তো বললাম। নিয়মে আটকে যাচ্ছে।”

একতা কান্নাভেজা গলায় বলে, “স্যর, ওটা আমার স্বপ্ন। আমি কিছু শুনতে চাই না। আমাকে নিতেই হবে।”

বসন্তস্যর বললেন, “ওটা আমার হাতে নেই। বাইরের অফিসার এসেছিলেন। তাঁকে টপকে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এনসিসি সেনাবাহিনীর মতো কঠোর নিয়মে চলে।”
একতার চোখ ছল ছল করে ওঠে, “আমার হাইট কম। এটা আমার দোষ?”

“না। তা কেন হবে?”

একতা জেদি ভঙ্গিতে বলল, “এক জন স্টুডেন্টের ইচ্ছেটাই বড় কথা নয়? আপনিই বলুন। ও সব আমি বুঝব না। এনসিসি আমি করবই। দরকার হলে স্যর, ওই অফিসারের পায়ে ধরব। আমাকে সুযোগ দেওয়া হোক স্যর। সুযোগ পেলে প্রমাণ করে দেব যে, আমি যোগ্য।”

বসন্ত স্যর শান্ত ভাবে বললেন, “তোমার জেদ দেখে আমার ভাল লাগছে। কারও জন্য যেটা করিনি, সেটা করব এ বার। উপরমহলে আমি স্পেশাল পারমিশন চেয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি। দেখা যাক!”

চার দিন পরে একতাকে ক্লাসের বাইরে ডেকে বসন্ত স্যর বললেন, “অভিনন্দন! তোমার জন্য স্পেশাল পারমিশন আদায় করে ছাড়লাম। কাল ফার্স্ট পিরিয়ডে ড্রেস দেওয়া হবে। পরশু শনিবার ছুটির পরে শুরু হবে প্র্যাকটিস। মনে রেখো, এখানে ডিসিপ্লিন আর পারফরম্যান্স আসল শর্ত। কোনও গড়বড় যেন না দেখি।”

আনন্দে ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল একতা। খুব হালকা লাগছে এখন। বুকের মধ্যে আটকে থাকা যন্ত্রণাটাও আর নেই।

শনিবার দুপুরে মাথায় এনসিসি-র গাঢ় নীল টুপিটা পরে শপথের ভঙ্গিতে বিড় বিড় করল একতা, “এই সুযোগের সম্মান আমি দেবই এক দিন।”

তিন মাস পরে ঝাড়খণ্ডের বসন্তপুরে এনসিসি-র ক্যাম্পে গেল একতা। স্কুল থেকে আট

জন ছাত্রছাত্রীকে এই ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়া, এই সময়ের মাঝখানে সমস্ত কিছুই একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে নিয়ম মেনে করতে হচ্ছে। এই ক্যাম্পে এসে আরও ভাল ভাবে ড্রিল করা শিখছে একতা। ক্যাম্পের শেষ দু'দিন ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। একতা গুরুং একক নৃত্যে প্রথম পুরস্কার জিতে নিল। মধ্য প্রদেশ থেকে আসা রবিনা তার পিঠ চাপড়ে বলল, "বড়িয়া ডান্স! তুমারা নেপালি ডান্স আচ্ছা লাগা। লেকিন তুমহারা ড্রিল সবসে বড়িয়া থি। রিপাবলিক ডে প্যারেড-কে লিয়ে তুম তৈয়ার হো যাও।"

ক্যাম্প থেকে ফিরে বসন্ত স্যরকে জিজ্ঞেস করল একতা, "স্যর, রিপাবলিক ডে প্যারেডে আমি চান্স পাব?"

বসন্ত স্যর বললেন, "পেতেই পারো। তবে খুব শক্ত প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম থেকে মাত্র বারো জন জুনিয়র এনসিসি ক্যাডেটকে সিলেক্ট করা হয়। তার জন্য সাংঘাতিক ঝাড়াই-বাছাই চলে। আমার মন বলছে যে, তুমি পেতে পারো। স্কুলের মধ্যে তুমিই সেরা। ওই সিলেকশনে তোমার মতো বিভিন্ন স্কুলের বেস্ট ক্যাডেটরা জান লড়িয়ে দেবে।"

"কী ভাবে সিলেক্ট করা হবে স্যর?"

"অনেক ক্যাম্প হবে। প্রতিটা ক্যাম্পে বাছাই করা হবে, পরের ক্যাম্পে যাবে। এই ভাবে ফাইনাল ক্যাম্পে মাত্র তিরিশ জন যাবে।"

ন'টা ক্যাম্প সাফল্যের সঙ্গে উতরে গিয়েছে একতা। এই বার ফাইনাল ক্যাম্প। ফাইনাল ক্যাম্প হচ্ছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। এখান থেকেই রিপাবলিক ডে প্যারেডের জন্য চূড়ান্ত টিম বাছাই করা হবে। একতা নিশ্চিন্ত মনে রয়েছে। জুনিয়র গার্লস উইংস থেকে সে অনায়াসে সিলেক্টেড হয়ে যাবে। স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে একতার।

প্রবল আত্মবিশ্বাসে ড্রিল-শো করল সে। এত দিন যা শিখেছে, নিখুঁত ভাবে করেছে। নিজের একশো ভাগ দিতে পেরেছে। আগামী কাল ক্যাম্পের শেষ দিন। আজ বিকেলেই লিস্ট বেরোবে।

বিকেলে লিস্ট ঘোষণা হতেই একতা বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। চূড়ান্ত তালিকায় তার নাম নেই। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে রইল সে। চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। কে যেন তার কানে ফিস ফিস করে

বলল, 'ওঠো একতা। কেঁদে কিছু লাভ হয় না। নিজে তুমি ড্রিলে পারফেক্ট ছিলে?'
একতা বিড় বিড় করল, "হ্যাঁ, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলাম।"

'দেন হারি আপ, একতা গুরুং!'

উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ড্রিল-ইনস্পেক্টরের কাছে গেল সে।

"আমি বাদ পড়লাম কেন স্যর? ড্রিলে কোথায় ভুল হল স্যর?"

ড্রিল-ইনস্পেক্টর কটমট করে তাকিয়ে রাগত ভাবে বললেন, "তার কৈফিয়ত তোমাকে দেব কেন? গেট লস্ট।"

ধমক খেয়েও একতা এতটুকু দমল না। সে সোজা অফিসার-ইন-কম্যান্ড-এর কাছে পৌঁছে গেল। দু'জন রক্ষী তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, পারল না। অফিসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে দৃঢ় গলায় বলল, "আমি বাদ পড়েছি স্যর।"

"সরি। টেক ইট স্পোর্টিংলি।"

"জানি স্যর। তার আগে আপনার সামনে এক বার ড্রিল করতে চাই। দেখার পরে আপনি বাদ দিলে, মুখ নিচু করে চলে যাব।"

"তা কী ভাবে হয়?"

"প্লিজ় স্যর। আমার কনফিডেন্স আছে। একটি বার সুযোগ দিন।"

অফিসার তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

"শুধু একটা সুযোগ, স্যর।"

একতার বলার ভঙ্গি দেখে অফিসার বললেন, "তুমি যে ভাবে বলছ, কনসিডার করতেই হচ্ছে। বি রেডি। দশ মিনিট বাদেই তোমার ড্রিল দেখব।"

একতা একটুও ঘাবড়ে না-গিয়ে ড্রিল করে দেখাল। ড্রিল শেষ করে সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, " ইজ় ইট ওকে, স্যর?"

অফিসার বললেন, "পরে বলছি।"

অফিসার ড্রিল-ইনস্পেক্টরকে ডেকে কী সব বলছেন! বোঝাই যাচ্ছে যে তাকে নিয়ে আলোচনা চলছে। উত্তেজিত ভাবে অফিসার হাত-পা নেড়ে কিছু বলছেন। ড্রিল-ইনস্পেক্টরের মুখ ঘেমে উঠছে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তা দেখে একতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে যেন বুঝেই ফেলেছে যে, এর পরে কী ঘটতে চলেছে।
অফিসার তাকে ইশারায় ডাকলেন।

কাছে গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল একতা।

অফিসার তার পিঠ চাপড়ে হাসলেন, "তুমি সিলেক্টেড।"

"রিয়েলি স্যর?"

"ইয়েস। দুর্দান্ত করেছ তুমি। তোমার মুখে-চোখে যে কনফিডেন্স ফুটে উঠেছিল, তা দেখেই এই সুযোগটা দিয়েছিলাম। আশা রাখি যে, তুমি রিপাবলিক ডে প্যারেডেও এই ভাবে পারফর্ম করবে।"

"একশো ভাগ চেষ্টা করব স্যর।"

রিপাবলিক ডে প্যারেডে সারা ভারত থেকে বাছাই করা একশো দশ জন ক্যাডেটের মধ্যে এক জন হয়ে সুন্দর প্যারেড করল একতা। এনসিসি ক্যাডেটদের সঙ্গে ফটো তুললেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য। সুসংবাদ এল যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম থেকে সেরা ক্যাডেট নির্বাচিত হয়েছে সে।

গলায় মেডেল ঝুলিয়ে স্কুলের

প্রেয়ার হলে দাঁড়িয়ে ছিল একতা। তার সাফল্যের খবরে সারা হলঘর করতালিতে ভেসে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক তাকে কিছু বলতে বললেন।

মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে চোখের জল মুছল একতা গুরুং। শুধু বলতে পারল, "শপথ নিয়েছিলাম যে আমার স্কুলকে এক দিন আমি গর্বিত করবই। আমি তা পেরেছি। নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে জয় এক দিন আসবেই।"

ছবি: রৌদ্র মিত্র

বাজিমাত

এ কী! ডাম্বেল হঠাৎ দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে গেল কেন? খুব গুরুত্বপূর্ণ সিন। ডাকাতসর্দার আলোচনাসভা বসিয়েছে। যে করেই হোক আলিবাবার বাড়ি চিনে, তাকে খবর দিতে হবে। সমু উইংসের ধার থেকে উঁকিঝুঁকি দেয়। খুলেছে, খুলেছে, ডাম্বেলের দাড়ি এক দিকে খুলে ঝুলেছে! সবার চোখ এড়িয়ে আনন্দে সমু ছোট করে লাফ দিয়ে নেয়।

তিলু আর সমু এ বার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। দু'বছর আগেও লোকে তাদের দেখার জন্য, নাটকে তাদের পার্ট শোনার জন্য মাঠে ভিড় করত। তারা মুখ্য চরিত্র না-পেলেও পার্শ্ব চরিত্রে বাঁধা। অথচ গত দু'বছর ধরে তারা দু'জনেই বাদ। উল্টে ডাম্বেল এখন হিরো হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, ডাম্বেল কী করে হিরো হয়? গত বছর কী কাণ্ডটাই না ঘটাল! এক দিনে দুটো নাটক করতে গিয়ে সব গুবলেট করে ছেড়ে দিল। পাড়ার নাটকে গোল পাকাল, আর স্কুলের নাটকের কথা না-জানাই ভাল। অথচ তার পরেও এ বার দিব্যি পাড়ার নাটকে নাম উঠে গেল! না, না, এই অবিচার তারা কিছুতেই মেনে নেবে না।

'তিলু' আর 'সমু' এই নামে পাড়ার সবাই ডাকলেও ওদের ভাল নামগুলো বেশ রাশভারী গোছের। তিলক চৌধুরী আর সমরেন্দ্র রায়। প্রতি বছর পুজোতে পাড়ায় নাটক হয়। এত দিন তিলু আর সমু নাটকে পার্ট পাবেই পাবে, এমন একটা ব্যাপার ছিল। পাড়ার নাটকে পার্ট পাওয়া মানে তার প্রেস্টিজ বেড়ে গেল। যদিও পাড়ার নাটকে পার্ট পাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। সূর্যকিরণ ক্লাবের যে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যে-সে ব্যাপার নয়। এই নাটককে ঘিরে ওদের একটা ছোটখাটো কর্মশালা হয়ে যায়। বাইরে থেকে খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কিছু ভাড়া করে আসে না। নিজেরা হাতে-কলমে তৈরি করে। এই রকম সব নানান কারণে সারা বছর ছোট ছেলে-মেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে।

নানা রকম ঝঞ্ঝাট এড়াতে পাড়ার বড়রা মিটিং করে একটা নিয়ম তৈরি করে দিয়েছেন। মোটামুটি ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের উপর সারা বছর ধরে নজর রাখা হয়। তারা ঠিক মতো স্কুলে যাচ্ছে কি না, লেখাপড়ায় কতটা ফাঁকি দিচ্ছে, বিকেলে মাঠে খেলতে না-এসে কারও বাড়ির কোণের ঘরে বা ছাদে মোবাইলে গেম খেলছে কি না ইত্যাদি। এই দায়িত্ব থাকে ক্লাবের বড় দাদাদের উপর। তারা সকলের অজান্তে সমুদের ব্যাচ আর তাদের চেয়ে ছোট যারা, তাদের উপর লক্ষ রেখে চলে। সমুরা এ বার ক্লাস এইট। এই ব্যাপারটা সকলের জানা আছে বলে, এরা সবাই চেষ্টা করে দুষ্টুমি কম করতে। আর করলেও, তা এই নজরদারদের আড়ালে।

সেই হিসেবে দেখতে গেলে পাড়ায় ডাম্বেলের রেকর্ড ভাল নয়। এক মাত্র খেলার মাঠে নিয়মিত হাজিরা ছাড়া লেখাপড়ায় ফাঁকিবাজির ব্যাপারটা কারও জানতে বাকি নেই। অথচ সেই ডাম্বেল গত বছর কী করে যেন পাড়ার নাটকের ডিরেক্টর শান্তনুদাকে ম্যানেজ করে নাটকে পার্ট বাগিয়ে নিয়েছিল। তিলু আর সমু বাদ পড়েছিল। নাটকে ডাম্বেল যা-তা কাণ্ড করেছিল। একই দিনে স্কুল আর পাড়ার নাটক ছিল। স্কুলে দুপুরে আর রাতে

পাড়ায়। পাড়ার নাটকে ডাম্বেলের ছিল গার্ডের রোল। যখন সময় এল, দেখা গেল সে চোরের সংলাপ বলতে শুরু করেছে। ব্যস, আর যায় কোথায়! সমস্ত দর্শক 'হা হা', 'হো হো', 'হি হি', কত রকম ভাবে হাসি জুড়েছিল। ডাম্বেলের অমন ভয়াবহ সংলাপ শুনে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে শান্তনুদা বিউটি সালোঁ থেকে করা তার অত সাধের 'কার্লি হেয়ার' টেনে টেনে প্রায় সোজা করে ফেলেছিলেন। অথচ তার পরেও...

হ্যাঁ, এই বছরেও ডাম্বেল নাটকে পার্ট পেয়েছে। 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' নাটক হবে। সেই নাটকে যে-সে পার্ট নয়, ডাম্বেল খোদ ডাকাতসর্দার। এখন ডাম্বেলের চলাফেরা, কথাবার্তা সব বদলে গেছে। শোনা যাচ্ছে, লেখাপড়ায় খুব মন দিয়েছে ডাম্বেল। যদিও সে কথা তিলু আর সমু মানতে নারাজ। তারাও তক্কে তক্কে আছে, যে করেই হোক ডাম্বেলকে জব্দ করবে। পারলে অবশ্য তারা পুরো নাটকই ভন্ডুল করে দেয়।

নাটকে পার্ট সিলেকশন হয়ে গেছে। মিড টার্ম শেষ হলে মহড়া শুরু হবে। মাত্র পনেরো দিন পরেই পরীক্ষা। শান্তনুদা বলে দিয়েছেন পরীক্ষা যে দিন শেষ হবে, সে দিন সবাই যেন ক্লাবে আসে। নাটকে বাকি যে সব কাজ আছে, সে সব কে কে করবে, তার দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন।

পরীক্ষার আগে আর কোনও গন্ডগোল হয়নি। শুধু সমু এক দিন দেখেছে বিকেল বেলা ডাম্বেল ওদের বাড়ির বাগানে লম্বা লম্বা লাফ দিচ্ছে। সমুর চোখে চোখ পড়তেই ডাম্বেল আরও লম্বা লাফ দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেছে।

পরীক্ষা শেষ। আপাতত লেখাপড়ার চাপ কম। এ বার জোর কদমে চলবে নাটকের প্রস্তুতি। হাতে সময় কুড়ি দিন। তার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মর্জিনা আর দাসদাসীদের নাচের ব্যাপারটা তমালীকাকিমা দেখে দেবেন। কাকিমা বলে দিয়েছেন, তাঁর সুবিধে মতো সময়ে নাচ তুলিয়ে দেবেন। সেই নিয়ে শান্তনুদা যেন চিন্তা না করেন। মহড়া শুরু হবে আগামী কাল থেকে। তিলু আর সমু নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করে রেখেছিল, যদি নাটকে অন্যান্য কাজের দায়িত্ব তাদের দেওয়া না হয়, তা হলেও ওরা নিয়ম করে মহড়া দেখতে আসবে। ভাল করে দেখবে, আর প্ল্যান করবে কী ভাবে ডাম্বেলকে নাটকের দিন জব্দ করা যায়।

শান্তনুদা এক এক করে সকলকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। হরিৎদার কম্পিউটারে জ্ঞান বেশ ভাল। তাকে শান্তনুদা দায়িত্ব দিয়েছেন বেশ কিছু পশু-পাখির আওয়াজ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার। পরের দিন শান্তনুদা শুনে ঠিক করবেন, কোনটা নাটকে কাজে আসবে আর কোনটা নয়। সেই সঙ্গে কিছু আরবি সঙ্গীত। নান্টু আর

পরিমল দায়িত্ব পেল রঙিন সেলোফেন পেপার কেনার। মঞ্চে আলোকসজ্জায় কাজে আসবে। সমুর দায়িত্ব স্ক্রিপ্ট চার খানা ফটোকপি করে আনা। সেই সঙ্গে রাতে পুরো স্ক্রিপ্টটা পড়া। সে আর টুবলু নাটকে প্রম্পটের দায়িত্বে থাকবে। সৈকতের হাতের কাজ খুব ভাল। ওর কাজ একটু অন্য রকমের। পিচ বোর্ডের কার্টআউট বানাতে হবে। কাশেমের প্রাসাদের মাপ চার ইঞ্চি আর ডাকাতের গুহার মাপ সাড়ে তিন ইঞ্চি। শান্তনুদা বুঝিয়ে দিলেন, এই কাটআউট মঞ্চের দুই কোণে রাখা ডিমার লাইটের সামনে ধরলে পিছনের সাদা পর্দায় 'ফুল স্ক্রিন' হয়ে দেখা যাবে কাশেমের প্রাসাদ আর ডাকাত সর্দারের গুহা। তিলুর পড়ল সম্পূর্ণ অন্য রকমের দায়িত্ব। তাকে গোটাআষ্টেক চায়ের ছোট খুরি আর কিছু ছোট সাইজের স্টোনচিপস নিয়ে আসতে হবে। এইগুলো নাটকে কী কাজে লাগবে, কারও মাথায় ঢোকেনি। শান্তনুদার থেকে জানতে চাইলে বলেছেন, কাল সকলে নিজের চোখে দেখতে পাবে। আর কথা না-বাড়িয়ে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ প্রতীমদার থেকে যার যতটুকু টাকা লাগবে নিয়ে, যেন বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ক্লাবে এসে সবাই অবাক হয়ে যায়। শান্তনুদা আর তিলু এক অদ্ভুত খেলায় মেতেছেন। সমুর একটু রাগ হয়। তিলু আগে ক্লাবে আসবে, তাকে জানায়নি। এমনকি তিলু এটাও বলেনি, তাকে শান্তনুদা আলাদা করে ডেকেছে। সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখতে থাকে তিলু আর শান্তনুদার কাণ্ডকারখানা। অল্প কিছুটা জায়গায় তিন সারিতে স্টোনচিপস পাতা। তার উপর চায়ের খুরি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট ছন্দে শব্দ হচ্ছে। তিলুর ছন্দ মাঝেমধ্যে কেটে গেলেও বোঝা যাচ্ছে স্টোনচিপস আর চায়ের খুরির মিলিত শব্দ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলছে। সবাই হইহই করে হাততালি দিয়ে ওঠে। শান্তনুদা ওদের বলেন, তিনি যখন হায়দরাবাদে একটি বিখ্যাত ফিল্ম সিটি দেখতে গিয়েছিলেন,

ওখানে এক জায়গায় এই ভাবে ঘোড়ার খুরের শব্দ করা হচ্ছিল। শান্তনুদার অনুরোধে সেই ভদ্রলোক শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

জোর কদমে মহড়া আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি শেষ করে এসে গেল আকাঙ্ক্ষিত দিন। এমনিতেই পুজো এসে গেছে বলে সকলের মনে খুশির রেশ। তার উপর পাড়ার ফাংশন। এ বার ডাম্বেলদের নাটক হচ্ছে ষষ্ঠীর দিনে। সকলের মতো সমু আর তিলুরও প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। ওরা যা পরিকল্পনা করেছে, তাতে শুধু ডাম্বেল জব্দ হবে তা নয়, পুরো নাটকটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

সাজঘরে নাটকের কুশীলব ছাড়া বাকিদের যাওয়ার অনুমতি নেই। অথচ সেখানে না-যেতে পারলে কাজ হাসিল হবে না। সমু বেজায় চিন্তায় পড়ে গেছে। এ দিকে তিলুর পাত্তা নেই। সে নাকি কালিকা মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে টিফিন আনতে গেছে। গেছে তো গেছে, আসার নাম নেই। এ দিকে সমু অস্থির ভাবে সাজ ঘরের বাইরে পায়চারি করে যাচ্ছে। মেকআপ হয়ে গেলে, আর কিছু করার থাকবে না।

নাটক শুরুর পনেরো মিনিট আগে তিলু এল। সমু ওর হাত ধরে টেনে এক পাশে নিয়ে এসে চাপা গলায় বলে, "কী ব্যাপার তোর? এত দেরি কেউ করে? এ বারে তুই সব গুবলেট করে দিলি।"

তিলু মুচকি হেসে সমুর হাত ছাড়িয়ে সাজঘরের দিকে চলে যায়। পিছন থেকে সমু চেঁচিয়ে ওঠে, "এখন আর গিয়ে কী করবি? যা হওয়ার সব হয়ে গেছে।"

তিলু পিছন ফিরে সমুকে দেখে হাসে। তা হলে কি তিলু কিছু ব্যবস্থা করেছে?

নাটক শুরু হয়ে গেছে। প্রথম দৃশ্যে মর্জিনা ও অন্যান্য দাস-দাসীরা নাচ-গান করছে। সেই সব শেষ হতে আলিবাবা বনে কাঠ কাটতে যায়। ডাকাতদের দেখা মেলে। পরের পর দৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ কোনও অঘটন ঘটছে না। সমু কোথাও নড়তে পারছে না। প্রম্পট করতে হচ্ছে। তিলু খুরি আর স্টোনচিপস নিয়ে উইংসের ধারে বসে আছে। যখন সময় হচ্ছে, ঘোড়ার খুরের শব্দ করছে। নাহ, তিলু বেশ ভাল রপ্ত করেছে ব্যাপারটা।

এ কী! ডাম্বেল হঠাৎ দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে গেল কেন? খুব গুরুত্বপূর্ণ সিন। ডাকাতসর্দার আলোচনাসভা বসিয়েছে। যে করেই হোক আলিবাবার বাড়ি চিনে, তাকে খবর দিতে হবে। সমু উইংসের ধার থেকে উঁকিঝুঁকি দেয়।

খুলেছে, খুলেছে, ডাম্বেলের দাড়ি এক দিকে খুলে ঝুলেছে! সবার চোখ এড়িয়ে আনন্দে

সমু ছোট করে লাফ দিয়ে নেয়। তা হলে তিলু কাজটা করতে পেরেছে। সে আর তিলু, দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করেছিল সাজঘরে আঠার শিশিতে জল মিশিয়ে দেবে, যাতে নাটক চলাকালীন কুশীলবদের নকল গোঁফ-দাড়ি খুলে যায়।

তিলু উঠে সমুর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, "ডাম্বেলের দাড়ি খুলেছে। এ বার শুধু দেখে যা।"

"কখন আঠায় জল মেশালি?" সমু জানতে চায়।

"জল মেশাইনি। ওরা যেটা লাগিয়েছে সেটা পান্তুয়ার রস। কাল রাতে বাবা পান্তুয়া এনেছিল। পান্তুয়া শেষ হয়ে গেলেও অনেকটা রস ছিল। মা সব সময় বাবাকে বেশি করে রসগোল্লা, পান্তুয়ার রস আনতে বলে। মা ওই রস চাটনিতে দেয়। দুপুরে ভাল করে রস ফুটিয়ে গাঢ় করে আঠার মতো করে শিশিতে ভরে, সাজঘরে রেখে এসেছি। সেই সময় আসল আঠার শিশি নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

"কেল্লা ফতে রে!" আনন্দে সমুর চোখ রাজভোগের চেয়েও বড় হয়ে গেছে।

এ কী! ডাম্বেল তো স্ক্রিপ্টের বাইরে গিয়ে সংলাপ বলছে!

ডাম্বেল বাকি ডাকাতদের উদ্দেশে বলছে, "তোমাদের যেন কেউ চিনতে না পারে। কোমর থেকে দোপাট্টা খোলো। চোখ দুটো খোলা রেখে, মাথা থেকে মুখ ঢেকে নাও। এসো সবাই আমার সঙ্গে।"

তত ক্ষণে বাকি ডাকাতদেরও গোঁফ-দাড়ি খুলতে শুরু করেছে। তারা আর দেরি না-করে ডাম্বেলের কথামতো কাজ করে। শান্তনুদা বেগতিক দেখে পর্দা ফেলে দেন।

নাটক ঠিকঠাক ভাবেই শেষ হয়েছিল। আঠা খুঁজে পাওয়া না-গেলেও ব্ল্যাকটেপ দিয়ে গোঁফ-দাড়ি আটকে ব্যাপারটা সামলে গিয়েছিল। শান্তনুদা নাটক শেষ হতে ডাম্বেলের পিঠ চাপড়ে বলেন, "তোর উপস্থিত বুদ্ধি তো দারুণ! একেবারে বাজিমাত করে দিয়েছিস। এক বছরে দারুণ ইমপ্রুভ করেছিস।"

ডাম্বেল লজ্জা লজ্জা মুখ করে হাসে।

সমু আর তিলু এই বছর থেকেই ডাম্বেলকে জব্দ করার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। পরের বার ওরা নাটকে পার্ট পেলে কোনও গোলমাল পাকাবে না। আর যদি না পায়... সে কথা পরে হবে।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলি

▶ আনন্দমেলায় গল্প পাঠাতে হবে ডাকে কিংবা ইমেলে। পত্রিকা দফতরের রিসেপশনে এসেও গল্প জমা দিতে পারেন।

▶ ডাকে কিংবা দফতরে জমা দিলে গল্পটি হাতে লিখে কিংবা কম্পিউটারে কম্পোজ় করে প্রিন্ট আউট নিয়েও পাঠাতে পারেন। তবে লেখাটি মনোনীত হলে তখন কিন্তু ইউনিকোডে কম্পোজ় করা সফ্‌ট কপি পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠালে কিন্তু গল্পটিকে প্রথমেই ইউনিকোডে কম্পোজ় করেই পাঠাতে হবে।

▶ গল্পের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল/ ফোন নম্বর পাঠানো বাধ্যতামূলক।

▶ গল্পের শব্দসংখ্যা ১৫০০-র মধ্যে রাখাই ভাল।

▶ গল্পটি যেন মৌলিক হয়। অন্য কোনও গল্পের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ কিংবা অনুকরণ হলেও চলবে না। এবং কোথাও যেন গল্পটি প্রকাশিত না হয়ে থাকে।

▶ ডাকযোগে গল্প পাঠানোর ঠিকানা: সম্পাদক, আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১।

▶ গল্প পাঠানোর ইমেল হল: anandamelamagazine@gmail.com

পুরনো কুঠির সামগ্রী দিয়েই বর্তমানের বাড়িটি নির্মিত হয় ১৮৯২ সালে

শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের অনেক অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। সেই কুঠিবাড়ি ঘুরে এসে লিখেছেন সুখেন বিশ্বাস।

সুখেন বিশ্বাস

উত্তরে বয়ে চলেছে পদ্মা। উত্তর-পশ্চিম কোণে গড়াই নদী। তারই মাঝে শিলাইদহ। এখানেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কুঠিবাড়ি। রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বার ফিরে এসেছে পদ্মা-তীরবর্তী মানুষের জীবনদর্শন, চির সবুজে ঘেরা অপরূপ প্রকৃতির কথা। কখনও কুঠিবাড়ি, কখনও বা পদ্মাবোটে বসে একের পর এক লিখে গেছেন কবি। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা লিখেছেন এখানে বসে। বহু ছোট গল্প, কিছু নাটক, উপন্যাসেরও সৃষ্টি হয়েছে এখানে। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র প্রায় সব চিঠিই তিনি শিলাইদহে বসে লিখেছিলেন।

এখানেই তরুছায়ায় বসে কবি আপন মনে গান গাইতেন

শিলাইদহ নামটি আধুনিক। অতীতে জায়গাটির নাম ছিল খোরশেদপুর। জানা গেছে, পদ্মা-গড়াইয়ের মিলিত প্রবাহের ফলে এক সময় 'দহ' সৃষ্টি হয়েছিল। এই দহেই শেলী নামে এক অত্যাচারী নীলকর সাহেব নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। তাই খোরশেদপুরের নাম হয়েছিল 'শেলীদহ'। অবশেষে সেটা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে শিলাইদহ।

আদিতে কুঠিবাড়িটি ছিল পদ্মার কাছাকাছি। পদ্মার ভাঙনে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা হলে আসল কুঠিবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। পুরনো কুঠির সামগ্রী দিয়েই বর্তমানের বাড়িটি নির্মিত হয় ১৮৯২ সালে। রবীন্দ্রনাথ নতুন-পুরনো মিলিয়ে ১৮৯১-১৯০১ পর্যন্ত অর্থাৎ

এক দশক কুঠিবাড়িতে থেকে জমিদারি দেখাশোনা করেছিলেন। জানা গেছে, নাটোরের মহারানির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ তাঁর শিশুপুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্য ১৮০০ সালে এই জমিদারি কিনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অবস্থানকালে কে আসেননি এই বাড়িতে? একাধিক বার এসেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী সহ একাধিক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন কুঠিবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা কল্লোলিনী পদ্মাকে। ১০ চৈত্র ১৩৪৬-এ লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা-প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে।'

ইট-রঙা প্রবেশ-তোরণের উপরে সোনালি রঙে লেখা 'রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি'

কুঠিবাড়ি ঢুকতেই শোভা পাচ্ছে বিশাল আকৃতির ইট-রঙা প্রবেশ-তোরণ। তার উপরে সোনালি রঙে লেখা 'রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি'। ভবনে ঢোকার রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান। রয়েছে ছোটদের খেলনা আর গৃহস্থালির সাজ-সরঞ্জাম। শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা আর রকমারি ব্যাগের বাহার মনকে চমকে দেবে। সবই স্থানীয় কুটিরশিল্পীদের তৈরি। রবীন্দ্র আমল থেকে 'কুলপি-মালাই'-এর রমরমা এখানে। কুঠিবাড়ি গেলাম, অথচ মালাই খেলাম না তা হতে পারে না। তোরণের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভবনের প্রাচীরবেষ্টনী। ঢুকেই ডান দিকে দেখা যাবে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল এই সব ফলের বাগান। আর বাঁ দিকে দু'টি গেস্ট হাউস— 'সোনার তরী' আর 'গীতাঞ্জলি'। অতিথি-নিবাসে এসি ও নন-এসি সুবিধে সহ খাবারের ব্যবস্থা আছে। কুঠিবাড়ির পিছন দিকে রয়েছে সারি সারি আম, জামরুলের গাছ। যাদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্র-সমসাময়িক। কিছু গাছ তাঁর নিজের হাতে

রোপণ করা। সেই সব গাছে লাগানো রয়েছে ছোট ছোট বোর্ড, যেখানে লেখা 'রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত গাছ'। কুঠিবাড়ির পশ্চিমেও রয়েছে একটি বড় পুকুর। ওই পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটের দু'পাশে কবি রোপণ করেছিলেন দু'টি বকুল গাছ। কথিত আছে বকুল ফুলের মৃদু গন্ধে মোহিত হয়ে যেতেন কবি। এবং তরুছায়ায় বসে কবি আপন মনে গান গাইতেন। এক সময় এই পুকুরেই শোভা পেত কবির ব্যবহৃত পদ্মাবোটটি। কিন্তু সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তারই একটি প্রতিরূপ স্থান পেয়েছে কুঠিবাড়ির এক তলায়। পুকুর পাড়ে রকমারি গাছের সারি মানব মনে এনে দেয় এক প্রচ্ছন্ন শান্তি। বৃক্ষরাজির মধ্যেই রয়েছে 'শিশু কর্নার', যেখানে শিশুদের জন্য রয়েছে খেলার জায়গা। পুকুরের পাড় জুড়ে সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে সহজেই বিশ্রাম নেওয়া যায়।

তিন দিকে বৃক্ষরাজি-বেষ্টিত কুঠিবাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে সেই ১৮৯২ থেকে। ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি ভাগাভাগি হওয়ার আগে পর্যন্ত কবি এখানেই কাটিয়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে কুঠিবাড়িটি পড়লে রবীন্দ্রনাথ এখানে আর বিশেষ আসেননি। ১৯২২ সালে শেষ বারের মতো শিলাইদহে এলেও কলকাতায় বসে মনে মনে পদ্মাপারের প্রকৃতিকে উপভোগ করতেন কবি। প্রায় ষোলো একর এলাকা জুড়ে কুঠিবাড়িটি বিস্তৃত। ১৮৯২ সালে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন কবির ভাইপো নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ বাড়িটির বর্তমান রূপ দেন।

দু'টি গেস্ট হাউস—গীতাঞ্জলি ও সোনার তরী

বাড়িটি মূলত ঢেউখেলানো প্রাচীরবেষ্টিত লাল রঙের টেরেস আকৃতির আড়াইতলা ভবন। নীচের তলা আর উপর তলা মিলে রয়েছে পনেরোটি কক্ষ। পুব ও পশ্চিমের ঝুল

বারান্দা ও তেকোনা ঢালু পিরামিড আকৃতির ছাদ কুঠিবাড়িতে বৈচিত্র এনেছে। টেরেস আকৃতির ভবনটি নির্মিত হয়েছে ইট, কাঠ, করোগেটেড শিট ও টালি দিয়ে। এই বাড়ির মূল উঠোনে রয়েছে একটি উন্মুক্ত পাঠশালা, একটি পাতকুয়ো ও রান্নাঘর। কুঠিবাড়ির মধ্যে রয়েছে একটি জাদুঘর। বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কাজ করেছেন, এই জাদুঘরে সেগুলিই প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন তাঁর লেখা চিঠি, আত্মপ্রতিকৃতি ইত্যাদি। এক তলার মাঝ কক্ষে রয়েছে খাজনা আদায়ের জন্য ব্যবহৃত টেবিল ও পদ্মাবোটের রেপ্লিকা। পশ্চিম দিকের প্রথম কক্ষে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের ফটো ও তাঁর ব্যবহৃত জলের ফিল্টার। সেই সময় ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিল যে ঘাস কাটার মেশিন, সেটি রয়েছে পরের কক্ষে। এক তলার অন্যান্য ঘরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পালকি, কাঠের আলমারি ইত্যাদি। কুঠিবাড়ির দোতলায় রয়েছে পালঙ্ক, পল্টুন, পল্টুনে ওঠার সিঁড়ি ও কবি ব্যবহৃত 'চপলা' নামের একটি স্পিডবোট। শিলাইদহে এসেই কুমারখালির বাউল ফকির লালন শাহের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বাউল গানের প্রতি তাঁর ভালবাসা এখান থেকেই জন্মায়। জানা গেছে, ও পার বাংলার জাতীয় সঙ্গীতের সুর তিনি শিলাইদহ ডাকঘরের হরকরা গগনচন্দ্র দাসের সুর থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কুঠিবাড়িতে বসেই তিনি প্রথম গ্রামোন্নয়ন ও আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। পরে এর বাস্তব রূপ দেন পতিসরে এসে। প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হয়। আর প্রয়াণ দিবস বাইশে শ্রাবণ। দেশ-বিদেশের অসংখ্য দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আগমনে মুখর থাকে প্রতিটি দিন। কবি- জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেখানে কেটেছে, তাকে ফিরে দেখার জন্যই বার বার ঘুরতে যাওয়া যায় শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে।

.

ফটো : লেখক